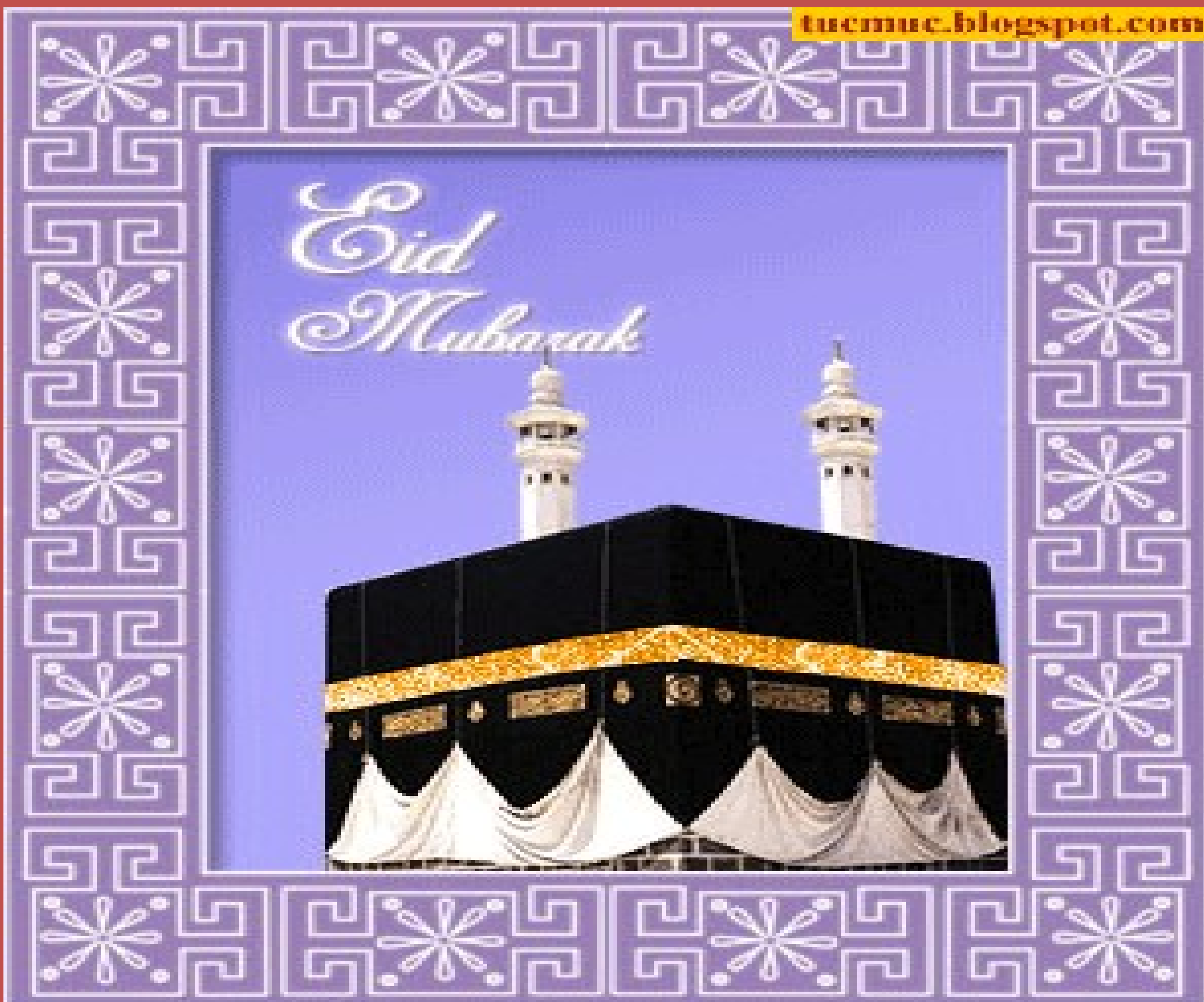
ওয়াজহুন জাদীদ্ লি-মুনকিরিত তাকল্লীদ্

(আহ্‌লে হাদিস ফিৎনার নতুন রূপ)



মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

ওয়াজহুন জাদীদ্ লি-মুনকিরিত তাকব্বলীদ্

(আহ্লে হাদিস ফিৎনার নতুন রূপ)

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

বি. এ., জিওগ্রাফী অনার্স (ফার্স্ট ক্লাস), বি. এড.,
মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি, রোহ্তাক, হরিয়ানা

আল হেরা প্রকাশনী

প্রকাশক ঃ মহঃ আব্দুল আলিম
শালজোড়, বীরভূম, পশ্চিম বঙ্গ

WAJHUN JADID LI-MUNKIRIT TAQLEED

Written by : Mohd. Abdul Alim
Geography (Hons.), First Class,
B. Ed. Maharshi Dayananda University,
Rohtak, Haryana.

Published by : Al-Hera Prakashani

Publisher : Mohd. Abdul Alim
Saljore, Birbhum,
West Bengal, Pin- 731124

First Print : 20 July 2013 (Ramjan)

---ঃ উৎসর্গ ঃ---

মুসলিম বিশ্বের সর্বকালের বরেণ্য চার ইমাম হজরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ), হজরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), হজরত ইমাম মালেক (রহঃ) ও হজরত ইমাম আহ্‌মদ ই বনে হাম্বল (রহঃ)-এঁর প্রতি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি উৎসর্গ করলাম।

--ঃ মুদ্রণে ঃ---

মওলানা কম্পিউটার প্রেস, প্রোঃ- কারিবুল হক, সেলারপুর,
পোঃ- সাহাপুর, বীরভূম। মোঃ- **৯৭৩৪০-৯৩৮৬০ / ৯৭৩২০-১৩৯১৪**

বিনিময় মূল্য ঃ ৬০/- (ষাট টাকা মাত্র)

-- ঃ সূচীপত্র ঃ --

বিষয়

প্রশ্নোত্তর পর্ব

জগৎ বিখ্যাত মুহাদ্দিস, শাইখুল আরবে ওয়াল আযম, যিনি নবী পাক হজরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর রওজা মুবারকের পাশে ১৮ বছর হাদিস পড়িয়েছেন, যিনি ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহন করে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দান করেছেন সেই মহান ব্যক্তি হজরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)-এর সহকর্মী ও সুযোগ্য আধ্যাত্মিক শিষ্য (মুরীদ), আলোড়ন সৃষ্টিকারী লা-মাজহাবীদের বিরুদ্ধে বহু গ্রন্থ প্রণেতা, সিপাহে আহ্নাফ, হজরত মওলানা ওসমান গণী সাহেবের

সুচিন্তিত অভিমত ও দোওয়া

আলহামদু লিল্লাহি কাফা, ওয়া ছালামুন্ আলা ইবাদিলাহিল্ লাযিনা ওফা। আম্মা বাদ "ওয়াকুল জায়াল হাক্কু ও যাহাকাল বাতিল। ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা।" (আল কোরআন) হকের আগমন, বাতিলের পলায়ন।

আমার দ্বীনি ভ্রাতা মুহাম্মদ আব্দুল আলিম বীরভূমীর সহিত আমার পত্রালাপ ও টেলিফোনালাপ প্রায় পাঁচ বৎসর ধরে চল্ছে। তিনি এই হত ভাগার লিখা **'কাশফুল হিজাব আন্ ওয়াজহি লা-মাজহাব'** (লা-মাজহাব রহস্য ফাঁস) পুস্তক খানা পাঠ করার পর প্রথম পত্রালাপ ও টেলিফোনালাপ আরম্ভকরেন। এই আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই উভয়ের মধ্যে একটা আন্তরিকতা গড়ে উঠে। হঠাৎ একদিন তিনি টেলিফোনে বললেন, আহ্লে হাদিসদের ফেৎনার প্রতিবাদে আমি একখানা বই লিখেছি। আপনার নিকট পাঠাব। বইখানা পড়ে মন্তব্য লিখে পাঠাবেন। কিছুদিনের মধ্যেই ঐ পুস্তকের খস্ড়া (প্রিন্টেড্) কপি ডাকযোগে পেলাম, কিন্তু মন্তব্য লিখতে হলে ত পুস্তকখানার আদ্য পান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা মূলক দৃষ্টি দিয়ে পড়তে হবে, কিন্তু সে ক্ষমতা ত আমার নাই । এক চক্ষু দৃষ্টি হীন, অন্য চক্ষু দৃষ্টি ক্ষীন, তদোপরী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদ্যা, বুদ্ধি জ্ঞান ও

দক্ষতার দৈন্যতা। একবার ভাবলাম একদম না করে দেই। পরক্ষনেই চিন্তা করলাম উনি মনে কষ্ট পাবেন, তাই পরামর্শ দিলাম মাদ্রাসা মাজাহিরে উলুম কনকপুর পাঁশকুড়া (জেলা- পূর্ব মেদনীপুর) গিয়ে মুফতী ইবরাহীম সাহেবকে দিয়ে পুস্তকখানা আগাগোড়া পাঠের পর মন্তব্য লিখে উহার জেরক্স কপি আমাকে পাঠাতে বললাম। তিনি যথা রীতি উপরুক্ত কাজ সেরে মুফতী সাহেবের মন্তব্য তৎসঙ্গে মাওলানা আজিজুল হক কাশেমী সাহেবের মন্তব্যের জেরক্স কপিও পাঠালন। এবার আমি একরূপ বাধ্য হয়েই মন্তব্য লিখার জন্য কলম হাতে নিলাম। উপরোক্ত আমার শ্রদ্ধেয় দুই মহা বিদ্যান বুজর্গ ব্যক্তির অভিমত এর উপর পূর্ণ আস্থা থাক্লেও আমি অতি কষ্টে ক্ষীন দৃষ্টিতে পুস্তক খানার বহুলাংশ স্বয়ং পাঠ করে দেখেছি। পুস্তকখানার যতটুকু অংশ পাঠ করেছি মনযোগ সহকারেই পাঠ করেছি। একজন ২৫ বৎসরের নওজুয়ান (গ্রাজুয়েট) এত অল্প বয়সে আহ্লে হাদিস সম্পর্কে এত বহুল সংখ্যক পুস্তক পুস্তিকা রোমন্থন করে বইখানা লিখেছেন আমি ত অবাক্ বরং হতবাক হয়ে গেলাম। ঐ ফেৎনা বাজ আহ্লে হাদিসদের প্রতিবাদে যেভাবে তিনি জেহাদী কলম ধরেছেন তাহাতে তিনি যথেষ্ট প্রসংসা ও ধন্যবাদের দাবী রাখেন। আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেবের লিখা পুস্তক কাট হুজ্জতির জওয়াব দিতে গিয়ে লেখক কিছু-কিছু জায়গায় ইঁটের বদলে পাটকেল ছুড়েছেন। সংযম হাতছাড়া করেছেন । হয়ত এটা তাঁর যৌবনের ধর্ম। আমি তাঁহাকে সংযম হাতছাড়া করতে না- করেছি। এক কবির ভাষায় --- ইষৎ হাসিয়া, আর্ত্ত কহিলা, তুইরে হাঁসালি মোরে। দাঁত আছে বলে কুকুরের পায় দংশি কেমন করে?......... এক উর্দু কবি বলেন ঃ- রাহ্মাতুল্লিল আলামিঁ কি শান দিখলাতে রাহো + গোলা বারী ওহ্ করে তুম ফুল বারছাতে রাহো। যাদের দলিলে জোর নাই, তাহারাই কখন গা-জোরী কখনও গলা জোরী করে থাকে। লিখকের পুস্তক খানা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেমন সাবলিল, তেমনি তথ্য বহুলও বটে। প্রতি ছত্রে ছত্রে লিখকের প্রতিবাদী কলম বাতিলের বিরুদ্ধে ঝংকারে ও হুংকারে এক আলোড়ন তুলেছে আমি ব্যক্তিগত ভাবে লিখককে পত্র দিয়েছি। তাহার প্রেরিত খস্ড়া কপিতে কিছু কিছু জায়গায় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের নোট দিয়েছি। ফাইনাল প্রুফ দেখার সময় আমার নোটগুলির প্রতি লক্ষ রাখতে অনুরোধ করি । পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলার জেনারেল শিক্ষিত নওজুয়ান ভ্রাতাদের অনুরোধ করি তাঁহারা যেন লিখকের পুস্তকখানা পাঠ করে অভিমত দিয়ে তাঁহার প্রচেষ্টা ও লিখনি শক্তিকে আরও জোরদার করে তোলেন। আহ্লে হাদিস ফেৎনা আজ শুধু ভারত বাংলায় সীমাবদ্ধ নাই। এরা দ্বীন ইস্লামের শত্রুদের সঙ্গে গোপন আঁতাত করে বর্ত্তমানে এই ফেৎনার ঢেউ কাবা শরীফের গায়েও ধাক্কা মারতে

আর করেছে। বর্ত্তমান কাবাশরীফের ইমাম ফজিলাতুস্ শাইখ্ ছালেহ এবনে মোহাম্মদ আলে তালিব গত ২৪ শে জুমাদাস্ সানিয়াহ ১৪৩২ হিজরী ইংরেজী ২৮শে মে ২০১১ খোত্‌বাহ্ নং- ৬৬২৭ এ কাবা শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্ব মুসলীমদের সাবধান করে বলেন ৪ মাজ্‌হাব অমান্যকারীর দল পথভ্রান্ত। সাহাবীদের অমান্যকারীরা ইস্‌লামের মূল উৎপাটনে বদ্ধ পরিকর। এই আহ্‌লে হাদিস ছালাফী দলটি দ্বীন ইস্‌লামের শত্রুদের সঙ্গে গোপন আঁতাত করে ইস্‌লামকেই ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এরা নকল ছালাফী, ছালাফে ছালেহীনদের নাম এদের নামের সঙ্গে যুক্ত করা ছালাফে ছালেহীনদের অপমান করার নামান্তর মাত্র। খোত্‌বাহ্‌টির আরবী অনুলিপি দারুল উলুম দেওবন্দে সুরক্ষিত আছে, এবং উহার উর্দু অনুবাদ আমার নিকট বিদ্যমান। অতএব পশ্চিম বঙ্গের সমাজ দরদী হানাফী উলামায়ে কেরাম ও জেনারেল শিক্ষিত ভ্রাতাদের ২৪ ঘন্টা সচেতন থাকার জন্য অনুরোধ করি। এবং এই বাতিল ফিরকার বিভ্রান্তিকর প্রচারের প্রতিবাদে সকলকেই কলম ধরতে ও সোচ্চার হতে অনুরোধ করছি। পরিশেষে লিখকের দীর্ঘায়ু কামনা ও খাতিমা বিল্ খাইরের কামনা করে শেষ করলাম।

ইতি-

আহকার- *মোঃ ওছমান গণী*

সাং- সুন্দরপুর, (দঃ দিনাজপুর)

তাং- 16/06/2013 ইং

বঙ্গ-বিখ্যাত মুহাদ্দিস, পাঁশকুড়া মাদ্রাসা জামিয়া মাজাহিরুল উলুম মাদ্রাসার শায়খুল হাদিস (শায়েখে সানি) হজরত মওলানা মুফতি মুহাম্মদ ইবরাহীম কাসেমী সাহেবের

সুচিন্তিত অভিমত

হামদ্ ও সালাতের পর,

এই পুস্তকের লেখক (মুহাম্মদ আব্দুল আলিম) আমার অপরিচিত। জেনারেল শিক্ষিত যুবক। আহ্‌লে হাদিস ভায়েরা বিভিন্নভাবে তাঁকে আহ্‌লে হাদিস মতাবলম্বী করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে লেখক হানাফী ও আহ্‌লে হাদিস দু-পক্ষের লেখকের বাংলা ও কিছু উর্দু বই

পড়াশুনা করেন। বক্ষমান বইটি অধ্যায়ণ ও তুলনামূলক বিচারের ফসল। লেখকের সঙ্গে পাণ্ডুলিপি দেখার সুত্রে পরিচয়।

বইটি খুবই উপযোগী, ভাল তথ্যে বইটি সমৃদ্ধ, সাধারণের জন্য খুবই উপযোগী, কিছু ক্ষেত্রে আলেমরাও উপকৃত হতে পারবেন। সংক্ষেপে অনেক কিছু জানার উপকরণ বইটিতে রয়েছে। প্রশ্নোত্তর পর্বটিও ভাল। লেখক কিছু উর্দুও জানেন। অনেক হাওয়ালা বাংলা কেতাব থেকে গ্রহণ করেছেন। উসুল ও উসুলে হাদিস ও বক্তব্য বর্ণনা ভঙ্গির একটু তফাৎ থাকলেও মূল বক্তব্য সঠিক আছে।

আল্লাহ পাক লেখককে সর্বদিক থেকে উন্নতি দান করুন। লেবাস-পোশাকে, চালচলনে সুন্নতের অনুসারী ও দ্বীনের খেদমতের জন্য কবুল করুন। ছাপাবার পূর্বে একটি ফ্রেস কপি পাঠানোর অনুরোধ রইল।

মুহাম্মদ ইবরাহীম (ক্বাসেমী)
খাদেমে হাদিস জামিয়া মাজাহিরুল উলুম
কনকপুর পাঁশকুড়া আর.এস.পূর্ব-মেদনীপুর
০২/০৫/২০১৩

ভারত বিখ্যাত মুহাদ্দিস, কুরআন হাদিসের বিদগ্ধ জ্ঞানী, যশস্বী তর্কবাগীশ (রাইসুল মুনাযিরিন), বহু গ্রন্থ প্রণেতা, পাঁশকুড়া মাদ্রাসা জামিয়া মাজাহিরুল উলুম মাদ্রাসার শায়খুল হাদিস হজরত আল্লামা আজিজুল হক কাসেমী সাহেবের

সুচিন্তিত অভিমত

নাহ্মাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম,

হামদ্ ও সালাতের পর লিখি যে, আলোচ্য বইটির প্রিন্ট-আউট কপি আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। অভিমত নেওয়ার জন্য। আমার সময়-সুযোগ না হওয়ায় আমি আমার সুযোগ্যতম

ছাত্র এবং আমাদের কনকপুর জামিয়ার হেড মুফতি ও শায়েখে সানী মুফতী ইবরাহিম সাহেবকে ভার দিয়ে ছিলাম গভীরভাবে দেখার জন্য। তিনি দেখে-শুনে সেই অভিমত দিয়েছেন, আমি সেই অভিমতকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি এবং বইটির বহুল প্রচারের জন্য দোওয়া করছি।

ইতি-বিনীত

মুহাম্মদ আজিজুল হক ক্বাসেমী

খাদেমে হাদিস শরীফ, জামেয়া.....কনকপুর পাঁশকুড়া,

০২/০৫/২০১৩

হজরত মওলানা আব্দুল কাদের সাহেবের

সুচিন্তিত অভিমত

বে-ইস্‌মিহি তায়ালা

আস্‌সালামু আলাইকুম,

স্নেহের আব্দুল আলিম গ্রাম- শালজোড়, জেলা-বীরভূম নিজে একটি বই লিখিয়াছে, উক্ত বইখানি মাঝে মাঝে পড়িলাম ব্যস্ততার কারণে সম্পূর্ণ পড়া সম্ভব হয় নাই, বই খানি নামধারী আহ্‌লে হাদিসদের প্রতিবাদে লিখিয়াছে এবং বহু মেহেনত করিয়া লিখিয়াছে, আশা করি হক পন্থি মুসলমান ভাইবোনের খুবই উপকার হবে ইনঃ, আমি আল্লার নিকট দোওয়া করি যেন তাহাকে সেই খিদমতের জন্য পুরো পুরো নেকি দান করেন, এবং এই বইটিকে সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য করিয়া তাহার জ্ঞানকে সামাজিক জ্ঞানে পরিণত করেন।

ইতি

(মওলানা) আব্দুল কাদের মাজাহেরী

সম্পাদক, বীরভূম জেলা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ,

তাং- 22/02/2013

তথাকথিত আহ্লে হাদিশদের স্বরূপ উন্মোচনকারী ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী বহু গ্রন্থ প্রণেতা বঙ্গ-বিখ্যাত মুনাজির, উকিলে আহ্নাফ, জামপুর মাদ্রাসার শায়খুল হাদিস জনাব হজরত মুফতি আল্লামা নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী সাহেবের

সুচিন্তিত অভিমত ও দোওয়া

বিসমিল্লা হির্রাহমা নির্রাহিম

জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম সাহেবের বইটির বহুলাংশ পড়ার সুযোগ হল মা'শাআল্লাহ্ ! লেখক তথাকথিত আহ্লে হাদিসদের সম্পর্কে বহু বইপত্র পড়াশুনা করেছেন। বইটির কিছু কিছু ক্ষেত্রে লেখকের আলিম না হওয়ার অভাব-বোধ হলেও বইটি অনেক নতুন তথ্য সমৃদ্ধ। উপস্থাপনার ভঙ্গিমাটুকু বাদ দিলে বইটি প্রশংসার দাবী রাখে। আল্লাহ্ পাক লেখককে উত্তরোত্তর সার্বিক উন্নতি দান করুন-- আমীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী

খাদিমে হাদিস শরীফ, জামিয়া জামপুর, উত্তর 24 পরগনা,

22/06/2013

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারীম

কিছু কথা

'আহলে হাদিস ফিৎনার নতুন রূপ' নামটি শুনে অনেকে হয়তো চমকে উঠতে পারেন এবং মনে মনে ভাবতে পারেন বর্তমান যুগে মুসলমানদের অবস্থা খুবই খারাপ। মুসলমানরা চারিদিকে জর্জরিত, নিপিড়িত ও অবহেলিত। এই সময় আহলে হাদিস ফিরকার বিরুদ্ধে বই লিখে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ না বাড়িয়ে পরস্পরে মিলেমিশে থাকা প্রয়োজন।

এই কথা শুনে অনেকের হয়তো ভালও লাগতে পারে। কিন্তু এখানে আমি বলব, যারা এরকম ধরণের কথা ভাবেন তাদের মাকে যদি কেউ অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে। তাদের বোনকে যদি কেউ বে-ইজ্জত করে অথবা তাদের স্ত্রীদেরকে যদি কেউ চোখ মেরে পালিয়ে যায় এবং তার সামনে যদি বলা হয় ভাইজান ! এই মুসলমানরা চারিদিকে জর্জরিত, নিপিড়িত ও অবহেলিত, এই সময় মানুষে মানুষে মারামারি না করে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না করে পরস্পরে মিলেমিশে থাকা প্রয়োজন। নিজের মা, বোন ও স্ত্রীকে নাও এবং পালিয়ে যাও। সেই মানুষটির ভিতর যদি সামান্যও ম নুষ্যত্ববোধ থাকে তাহলে সে কোনোদিনই পালাবে না। গালি দিয়ে ডিক্সনারী খালি করে দেবে এবং যে তার সামনে এরকম ধরণের কথা বলবে তার চোয়ালের ৩২টা দাঁত ভেঙে গুঁড়ো করে দেবে তবুও নিজের মা, বোন, স্ত্রীর বে-ইজ্জত সহ্য করবে না।

অনুরূপভাবে যদি ইংরেজদের পয়দাবার, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নাজায়েজ সন্তান কোন আহলে হাদিস ফিরকার লোক এসে ইমামদের গালি দেয়, আওলিয়ায়ে কেরামদের

বিরোধিতা করে বা সাহাবায়ে কেরামদেরকে বিরোধিতা করে বা সাহাবায়ে কেরামদেরকে ফাসেক, মুর্তাদ বলে গালিগালাজ করে তাহলে আমি মনে করি নিজের মা, বোন স্ত্রীকে বে-ইজ্জত করলে যেমন কেউ সহ্য করবে না তেমনি ইমামদের, আওলিয়াদের বা সাহাবাদের গালিগালাজকারীকেও কেউ সহ্য করবে না। যদি কোন নালায়েক এরকম কাজ করে তাহলে তার চোয়ালের ৩২টা দাঁত ভেঙে গুঁড়ো করে দেবে।

আর আহলে হাদিস দলের লোকেরা ইসলাম ধর্মকে হাদিসের প্রতি আমল করার নাম করে যেভাবে আক্রমণ করেছে তা কোন বিবেকবান মুসলমান কোনদিনই বরদাস্ত করবে না। আহলে হাদিস দলের লোকেরা যতই হাদিস হাদিস বলে চিৎকার করুক, তারা কোনদিন সহিহ্ হাদিসের উপর আমল করে না। তারা তাদের খাহেসের অনুকুলে যে হাদিসই পায় তাকে তারা 'সহীহ হাদিস' বলে আমল করতে শুরু করে এবং এটা করাকে তারা উত্তম জেহাদ বলে মনে করে। এই আহলে হাদিস নামক বাতিল ফিরকাটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম রূপ ধারণ করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। কখনও মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নাজদী সেজে নিজেদেরকে 'ওহাবী' বলে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং নিরীহ মুসলমানদেরকে হত্যা করাকে জায়েজ বলে ম নে করেছে, কখনও আব্দুল হক বেনারসীর রূপ ধারণ করে নিজেদেরকে 'মুহাম্মদী' বলে পরিচয় দিয়েছে এবং উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এর মতো জবরদস্ত সাহাবী সম্পর্কে বলেছে, "হযরত আলী (রাঃ) এর সঙ্গে যুদ্ধ করে হযরত আয়েশা (রাঃ) মোরতাদ (ইসলাম থেকে খারিজ) হয়ে গিয়েছেন যদি তওবা না করে মারা যান তাহলে কাফের হয়ে মারা গেছেন।" অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে মা আয়েশা (রাঃ) কে কাফের বলে গালিগালাজ করেছে। কখনও বা মহম্মদ হোসেন

বাটালবীর রূপ ধারণ করে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে আহলে হাদিস নামটি রেজিষ্ট্রী করে বৃটিশদের বিরুদ্ধে জেহাদ করাকে হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছে। কখনও বা মিঁয়া নাযির হোসেন দেহলবীর রূপ ধারণ করে বৃশি আহত মহিলাকে সেবা শুস্রুষা করে ইংরেজদের তাঁবুতে পৌছে দিয়ে ইংরেজদের কাছ থেকে 'শামসুল উলামা' খেতাবে ভূষিত হয়েছে। কখনও বা তারা ওয়াহীদুয যামান হায়দাবাবদীর রূপ ধারণ করে শিয়াতের মতো মুতা বিবাহকে অর্থাৎ একদিন দুই দিনের জন্য সাময়িক বিবাহকে তারা হালাল বলে ফতোয়া দিয়েছে। অর্থাৎ এই ভেকধারী আহলে হাদিস দলের লোকেরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম রূপ ধারণ করে মুসলমান সমাজে বিভ্রান্ত ছড়িয়েছে। আর বর্তমান যুগে এই ভেকধারী দলটি কোথাও মিরাজ রববানীর রূপ ধারণ করে আবার কোথাও মওলানা জরজীসের রূপ ধারণ করে, কোথাও তওসীফুর রহমানের রূপ ধারণ করে, কোথাও তালেবুর রহমানের রূপ ধারণ করে আবার কোথাও জালালুদ্দিন কাসেমীর রূপ ধারণ করে মুসলমানদের ইমানকে বরবাদ করে দিচ্ছে।

আজকের দিনে মুসলমানরা যদি এই দলটি সম্পর্কে সচেতন না হন তাহলে এমন একদিন দেখা যাবে এই দলটি মুসলমানদেরকে মজহাবী 'কালাদার' বাঁধন থেকে মুক্ত করে দিয়ে ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। মুসলমানরা যদি একটু সচেতন হন তাহলে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নাজায়েয সন্তান এই লা-মজহাবী আহলে হাদিস দলটি কোনদিনই মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠতে পারবে না।

সব থেকে বড় কথা হল, আমাদের উলামায়ে কিরামরা যদি প্রতি জুমার দিনে খুতবার সময় মিম্বাবার ও মিহরাবে দাঁড়িয়ে, কিংবা জলসা বা দুয়ার মজলিসে আহলে

হাদিসদের রহস্য ফাঁস করতে শুরু করে দেন। যেমন কিভাবে ইংরেজ সরকার আহলে হাদিস দলটাকে তৈরী করল, কিভাবে তারা বৃটিশ জামানায় ইংরেজদের চামচাগিরি করেছে। এদের ফতোয়ার গ্রন্থে কি কি জঘন্য মাসআলা বর্ণিত আছে। যেমন এরা পুরুষদের হস্তমৈথুন করাকে জায়েয বলে, ব্যভিচারের ফলে জন্ম হওয়া নিজের কন্যাকে এরা বিবাহ করা জায়েয বলে, এরা মদকে পবিত্র বলে মনে করে এবং সুদ নেওয়াকে জায়েয বলে মনে করে, শূকরকে পবিত্র পশু বলে মনে করে, হায়েজ নেফাসের রক্ত ছাড়া সমস্ত মানুষ ও পশুর রক্তকে এরা পবিত্র বলে মনে করে এবং এরা দাড়িওয়ালা ব্যক্তি কোন গায়ের মুহাররম (অচেনা বা যার সঙ্গে বিবাহ করা জায়েয) মহিলার স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধ চুষতে পারে। এসব মাসআলা যদি সাধারণ মানুষ বা যাঁরা আহলে হাদিসদের সম্পর্কে কিছুই জানেন না তাদের সামনে যদি বর্ণনা করতে শুরু করে দেন, তাহলে আমি আল্লাহর কসম করে বলছি কাদিয়ানিদের যে জঘন্য পরিণতি হয়েছে তার থেকেও জঘন্য পরিণতি এই আহলে হাদিস নামধারী লা-মজহাবীদের হয়ে যাবে।

আহলে হাদিস দলের লোকেরা কথায় কথায় বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের দলীল তলব করে, যেন মনে হয় এরা মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে আসার সময় ডানহাতে বুখারী শরীফ ও বামহাতে মুসলিম শরীফ নিয়ে পয়দা হয়েছিল। অথচ লক্ষ্য করলে দেখা যায় বুখারী শরীফের হাদিসে বর্নিত বহু মাসআলা এমন আছে যেগুলো এরা আদৌ মানে না। সাধারণ আলেম-উলামারা যদি একটু সচেতন হয়ে বুখারী ও মুসলিম শরীফের সেই হাদিসগুলো তুলে ধরেন যে হাদিসগুলোর উপর আহলে হাদিসরা আমল করে না, তাহলে আযানের আওয়াজ শুনে শয়তান যেমন বায়ু ত্যাগ করতে করতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালায় ঠিক সেই রকম এই ভেকধারী আহলে

হাদিস দলের লোকেরাও বুখারী-মুসলিম শরীফের হাদিস দেখে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাবে। দ্বিতীয়বার তারা আর কাছেও ঘেঁসতে পারবে না।

বর্তমান আহলে হাদিস দলের অন্যতম গুরু মিরাজ রববানী তো সারা বিশ্বের সমস্ত আওলিয়ায়ে কেরামদের নাম ধরে ধরে কাফের ও মুরতাদ বলেছে। এই ভদ্রলোক ভদ্রতার সীমানা অতিক্রম করে ইতরামীকে প্রশ্রয় দিয়ে হযরত বায়জিদ বোস্তামী (রহঃ)-কে, জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)-কে আব্দুল আজিজ দববাগ (রহঃ)-কে, খাজা মইনুদ্দীন চিসতী (রহঃ)-কে নাম ধরে কাফের ও মুর্তাদ বলেছে এবং খাস করে খাজা মইনুদ্দীন চিসতী (রহঃ)-কে হিজড়া বলে গালিগালাজ করেছে। এই ভদ্রলোক বলেছে, উপরিউক্ত বুযর্গানে দ্বীনরা নাকি যখনই কোন তরুণ ছেলে দেখতেন তার সঙ্গে পায়খানার রাস্তায় সঙ্গম করতে শুরু করে দিতেন। (নাউজু বিল্লাহে মিন জালেক) অথচ বুখারী শরীফের হাদিসে আছে, আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেছেন, "যে লোক আমার 'অলীর' সঙ্গে শত্রুতা করে, সে আমার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়।" (বুখারী শরীফ)

প্রিয় পাঠক ! এটাই কি বুযর্গানে দ্বীনদের মুহববত ! এটাই কি আওলিয়া আল্লাহর মুহববত ! যে দলের লোকেরা হযরত বায়জিদ বোস্তামী (রহঃ)-কে, জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)-কে কাফের ও মুরতাদ বলে গালিগালাজ দেয়, খাজা মইনুদ্দীন চিসতী (রহঃ)-কে হিজড়া বলে গালি দেয় তারা কি কোনোদিন মুসলমান হতে পারে ? আসল কথা হল, শিয়ারা যেরকম ততক্ষণ পর্যন্ত, পরিপূর্ণ শিয়া হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সাহাবায়ে কেরামদের গালি না দেয়। অনুরূপভাবে শিয়াদের ছোট ভাই আহলে হাদিস দলের লোকেরাও ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ আহলে হাদিস হয়না যতক্ষণ না

পর্যন্ত তারা বুযর্গানে দ্বীনদের, আওলিয়ায়ে কেরামদের গালি না দেয়। পাঠকদের বলব, বৃটিশদের তৈরী করা গায়ের মুকাল্লিদ বা আহলে হাদিস নামক বাতিল ফিরকা থেকে আমাদেরকে প্রত্যেককে সাবধান থাকতে হবে।

পাঠকদের জানিয়ে রাখি মানুষ মাত্রেই ভুল হয় । পুরো সৃষ্টি জগতে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় নবী রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ছাড়া কেউ ত্রুটিমুক্ত নয় । তাই এই বইয়ের মধ্যে ভুল ভ্রান্তি থেকে যাওয়া কোন বিচিত্র নয়। আর এই বইটি আমি প্রচণ্ড তাড়াহুড়ো করে অল্প সময়ের মধ্যে রচনা করেছি, তাই এই বইয়ের মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই পাঠকদের বলি এই বইয়ের মধ্যে যদি কোনো ভুল-ভ্রান্তি, আপনাদের নজরে পড়ে আমাকে জানাবেন। তাহলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ।

একটি কথা না বলে পারি না, এই বই লিখতে যিনি আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন তিনি হলেন বারাবন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হাফেজ মাওলানা নাসিরুদ্দিন সাহেব। তিনি যদি এই বই লিখতে আমাকে উৎসাহ না দিতেন তাহলে এই বই হয়তো এত তাড়াতাড়ি প্রকাশ করতে পারতাম না। তাই হাফিজ সাহেবকে জানায় অশেষ ধন্যবাদ।

পরিশেষে পাঠকদের জানায়, আপনারা দোয়া করবেন আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের ইমান বৃদ্ধি করে দেন এবং খাতিমা বিল্ খায়ের দান করুন। (গ্রন্থাকার)

মুহাম্মদ আব্দুল আলিম

Mob.- +919635458331

E-mail-md.abdulalim1988@gmail.com

আহলে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদিন ফিরকার উৎপত্তির ইতিহাস

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আহলে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদিন ফিরকার অস্তিত্ব সারা পৃথিবীর মধ্যে ইতিপূর্বে কোথাও ছিল না। কেবলমাত্র ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে কিছু কিছু দেখা যায়। আর যা কিছু দেখা যায় তা ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের পরে। ইতিপূর্বে এই ফিরকার কোনো নাম ও নিশানা খুঁজে পাওয়া যেত না। তার কারণ, এই আহলে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদিন নামক বাতিল ফিরকার জন্মদাতা হল বৃটিশ সরকার। যেমন প্রখ্যাত গায়ের মুকাল্লিদ মাওলানা নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালী সাহেব স্বয়ং একথা স্বীকার করে লিখেছেন, ‘‘আসল কথা হল, যখন থেকে ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম এসেছে তখন থেকে মুসলমানদের অবস্থা এই ছিল যে, অধিকাংশ মানুষ রাজা বাদশাহের তরিকা ও মজহাব পছন্দ করত। তখন থেকে এই পর্যন্ত (অর্থাৎ ইংরেজরা আসা পর্যন্ত) সমস্ত মুসলমান হানাফী মজহাবের অনুসারী ছিলেন। এবং এই মজহাব অনুসারে আলিম, ফাজিল, কাজী, মুফতী এবং হাকিম হতেন। এমনকি উলামাদের এক বৃহত্তম দল মিলিত হয়ে ‘ফাতওয়া হিন্দিয়া’ (ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি) নামক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। এদেরই মধ্যে ছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এর সুযোগ্য পুত্র শাহ আব্দুর রহিম সাহেব।’’ (তরজুমানে ওহাবিয়া, পৃষ্ঠা-৮৬)

বিখ্যাত আহ্‌লে হাদিস মওলানা মুহাম্মাদ শাহ জাহানপুরী লিখেছেন, ‘‘কিছুদিন থেকে হিন্দুস্তানে এমন এক অপরিচিত মাজহাবের মানুষ দেখা যাচ্ছে যাদের থেকে সাধারণতঃ মানুষ অচেতন। আগের যুগে এই ধ্যান-ধারণার মানুষ কোন কোন জায়গায়

হয়ত দেখা যেত কিন্তু এত বেশী দেখা যেত না। বরং এদের নাম কিছুদিন থেকে শুনছি। তারা নিজেদরকে 'আহ্লে হাদিস' অথবা 'মুহাম্মাদী' অথবা 'মুওয়াহীদ' বলে পরিচয় দেয়। অথচ তাদের বিপরীত ধ্যান-ধারণার মানুষেরা তাদেরকে 'গায়ের মুকাল্লিদ' অথবা 'ওহাবী' অথবা 'লা-মাজহাবী' নামে আখ্যায়িত করে। (আল ইরসাদ ইলা সাবীলির রসাদ, পৃষ্ঠা-১৩)

এখানে আহলে হাদিস মাওলানা নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালী ও আহ্লে হাদিস মওলানা মুহাম্মাদ শাহ জাহানপুরী সাহেবের স্বীকারোক্তি থেকে প্রমাণিত হয় ভারতবর্ষে ইংরেজরা আসার আগে প্রত্যেক মুসলমান, যেমন রাজা-বাদশাহ, আমীর-উমরাহ, আলেম, উলামা প্রত্যেকেই হানাফী মজহাবের অনুসারী ছিলেন। তখন এই আহলে হাদিসদের নাম ও নিশানা ছিল না।

আর আহলে হাদিস শব্দটির নামকরণটিও বৃটিশ সরকারের দেওয়া। বৃটিশ সরকারই লা-মযহব গায়ের মুকাল্লিদিনদেরকে আহলে হাদিস নামকরণে ভূষিত করে। আহলে হাদিস দলের প্রখ্যাত আলেম মহম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেব বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে নিজেদের জন্য আহলে হাদিস নামটি রেজিষ্ট্রি করিয়ে নেন। ভারতবর্ষে উলামা সম্প্রদায় যখন বৃটিশদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন তখন জেহাদী উলামার্দিঁকে বৃটিশ সরকার 'ওহাবী' আখ্যায় আখ্যায়িত করে এবং তাঁদের জেহাদী মনোভাবকে দমন করার উদ্দেশ্যে নানা রকম ষড়যন্ত্র করতে থাকে। এমনকি জেহাদী উলামাগিগকে বৃটিশ সরকার নানাভাবে উৎপীড়ন করতে থাকে। ঐতিহাসিক মিস্টার টমসন যিনি ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তিনি লিখেছেন "দিল্লীর চাঁদনী চক থেকে খয়বার পর্যন্ত এরূপ কোনো গাছ ছিল না, যার

ডালে উলামায়ে কিরামের গর্দান ঝুলেনি।" তিনি আরও বলেন, "আলেমদেরকে শূকরের চামড়ার ভিতরে ভরে জ্বলন্ত চুলার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। লাহোরে রাবী নদীতে বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে ৮০জন আলেমকে প্রতিদিন নিক্ষেপ করা হত। এবং তাদেরকে গুলি করা হত।"

"চল্লিশ জন আলেমকে জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গে উলঙ্গ করে জ্বালানো হচ্ছে। তারপর আরো ৪০জন আলেমকে জালানোর জন্য সেখানে আনা হল সেখানে ইংরেজরা তাদের সম্বোধন করে বলেছিল, মৌলবীর দল উক্ত ৪০জন আলেমকে যে রূপ জালিয়ে ভস্ম করে দেওয়া হয়েছে, তোমাদেরকে অনুরূপ জালানো হবে। তোমরা যদি এখন বলো যে, আমরা আযাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিনি তাহলে তোমাদের ছেড়ে দিব। আমার সৃষ্টিকর্তার কসম, আমি দেখলাম যে, তাঁদের কোনো একজন আলেমও ইংরেজদের সম্মুখে মাথা নত করেন নি। বরং পূর্বের ৪০জনের ন্যায় পরবর্তী ৪০ জনও অগ্নিস্ফুলিঙ্গে জলে শাহাদাত বরণ করলেন। তাঁদের কেউই ইংরেজদের সম্মুখে মাথা নত করতে রাজী হলেন না।" (উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন, পৃষ্ঠা, ৭৯)

এইভাবে যখন বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষে উলামায়ে কিরাম দিগকে নানাভাবে অত্যাচার উৎপীড়ন করতে থাকে তখন ইংরেজদের অত্যাচারের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য লা-মযহবী গায়ের মুকাল্লিদিন মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী বৃটিশদের দরবারে গিয়ে নতজানু হয়ে সরকারী খাতায় নিজেদের নাম 'আহলে হাদিস' করে নেয়। প্রখ্যাত লা-মযহবী গায়ের মুকাল্লিদিন মৌলবী আব্দুল মজিদ সাহোরাওয়ারদি সাহেব নিজে লিখেছেন, "মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী 'এশায়াতুস্ সুন্নাহ'র মাধ্যমে

আহলে হাদিস দলের প্রচুর সেবা করেছেন, 'ওহাবী' শব্দটি তাঁরই প্রচেষ্টায় সরকারী দফতর ও কাগজ পত্র থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং 'জামাআতে আহলে হাদিস' নামকরণ করেছেন।" (সিরাতে সানায়ী, পৃষ্ঠা-৩৭২)।

সুতরাং দেখা যায় মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী যিনি লা-মযহব গায়ের মুকাল্লিদিন দলের মুখপাত্র ছিলেন তাঁর প্রচেষ্টায় 'ওহাবী' শব্দটি উঠিয়ে নিয়ে 'আহলে হাদিস' নামকরণের জন্য ইংরেজ সরকারের কাছে দরখাস্ত পেশ করেছিলেন। যে দরখাস্তের মাধ্যমে মহম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেব নিজেদেরকে ইংরেজ সরকারের নিমক হালালী এবং চামচাগিরির কথা বর্ণনা করেছেন। যে মর্মান্তিক মুহূর্তে সমাজ, দেশ ও মানবজাতিকে বাঁচানো প্রয়োজন সেই সময় জনাব মহম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেব নিজেদের দলকে বাঁচানোর জন্য তাঁর রক্ত শুকিয়ে গেছে। যাইহোক 'ওহাবী' শব্দটি কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জেহাদী ও বৃটিশ বিরোধী উলামায়ে কিরামদের জন্য ব্যবহৃত হত সেই ওহাবী শব্দটিকে উঠিয়ে দিয়ে নিজের জন্য আহলে হাদিস নামকরণটি ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে রেজেষ্ট্রি করিয়ে নেন।

জনাব আব্দুল মজিদ সাহোরাওয়ারদি সাহেব আরও লিখেছেন "তিনি (মহম্মদ হোসেন বাটালবী) বৃটিশ সরকারের সেবাও করেছেন এবং পুরস্কার স্বরূপ সম্পত্তিও (সরকারের কাছ থেকে) উপার্জন করেছেন।" (সিরাতে সানায়ী, পৃষ্ঠা-৩৭২)

সুতরাং বোঝা গেল মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবীর প্রচেষ্টায় বৃটিশ সরকারই লা-মযহব গায়ের মুকাল্লিদিনদেরকে 'আহলে হাদিস' খেতাবে ভূষিত করে। এক কথায়

বলা যায় 'আহলে হাদিস' নামটি বৃটিশ সরকারের দেওয়া নাম। (তথ্যসূত্র-আহ্লে হাদিস আওর আংগ্রেজ)

বৃটিশের চামচা কারা ?

ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় গায়ের মুকাল্লিদিন লা-মযহব ফিরকাটি বৃটিশ সরকারের চামচাগিরিতে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেছেন। ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসার আগে তাদের নাম ও নিশানা এদেশে ছিল না। ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসার বহু পরে এই বাতিল দলটির ভিত্তি স্থাপিত হয়। আরও দেখা যায় ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসার আগে এই দলটির নিজেদের কোনো মাদ্রাসা কোনো মসজিদ, কোনো খানকা, কোনো ইমারত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যা কিছু হয়েছে ইংরাজরা ভারতবর্ষ দখলের পর। আর এই বাতিল ফিরকার বর্ণনা ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসার পূর্বে কোনো ঐতিহাসিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। পুরো আহলে হাদিস সম্প্রদায়কে আমাদের পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ রইল, ইতিহাসের কোনো বর্ণনা থেকে প্রমাণ করে দিক, যে আহলে হাদিস ফিরকা বর্তমানে মওজুদ রয়েছে তার কোনো অস্তিত্ব পূর্বে ছিল কিনা। তারা কোনো ঐতিহাসিক গ্রন্থ, তফসীর এবং হাদিসের আলোকে একথা প্রমাণ করতে পারবে না যে আহলে হাদিস দল বর্তমানে রয়েছে তা আগেকার যুগেও ছিল যারা মুকাল্লিদিনদেরকে মুশরিক বলে ফতোয়া দিয়েছেন। এই কথা কোনো বাপের ব্যাটা প্রমাণ করতে পারবে না। তাদের দলের উৎপত্তিই হয়েছে ইংরাজরা ভারতবর্ষ দখলের বহু পর।

ইংরেজদের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে যখন আহলে হাদিস দলের ভিত্তি স্থাপিত হয় তখন তাদের দলের প্রতিটি মৌলবী, মোল্লা বৃটিশদের পদলেহন করতে শুরু করেন এবং তাদের চামচাগিরিতে লিপ্ত হয়ে পড়েন।

মৌলবী নাযির হোসেন দেহলবী আহলে হাদিস দলের প্রখ্যাত আলেম ছিলেন যিনি ইংরেজ সরকারের কাছে 'শামসুল উলামা' খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এম, মুনিরুজ্জামান লিখেছেন, ‘‘সৈয়্যদ আহমদের মত তিনি কেবল বৃটিশভক্ত ছিলেন না, তাঁর মত ঘোরতর কংগ্রেস বিরোধীও ছিলেন। তাঁর উপন্যাসগুলির অনেকের মধ্যে তাঁর নিজের জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে এবং সেখানেও তাঁর বৃটিশের প্রতি অনুরক্তি প্রকাশ পেয়েছে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এই আনুগত্যের জন্য তাঁকে 'খাঁন বাহাদুর' ও 'শামসুল উলামা' খেতাব দিয়েছেন।’’ (উপমহাদেশের মুসলমান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৭)

ইতিহাস পাঠ করলে আরও দেখা যায়, ১৮৫৭ সালে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বাহাদুর শাহ্ জাফরের নেতৃত্বে হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধ ভাবে যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেই সময় মাজহাব অমান্যকারীদের পক্ষ থেকে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ না করার জন্য প্রচার করা হয়েছিল। ইংরেজ সরকার বিদ্রোহ দমন করতে সারা দেশে ৫২ হাজার ওলামাকে শহিদ করে। দু'লক্ষ কুর্আনের কপি জালিয়ে দেয়। ইংরেজ সরকার ১৯শে সেপ্টেম্বর যখন দিল্লী নিজের নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসে, তখন কেবল মাত্র দিল্লীর বুকেই ৩ হাজার ভারতীয়কে ফাঁসি দেয়। ঐ সময় দিল্লীর বুকে সাতাশ হাজার মুসলমান ইংরেজ কর্তৃক নিহত হন। টানা সাতদিন পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে। এমন সময় গায়ের মুকাল্লিদ বা 'আহ্লে হাদিস' নেতা মিঁয়া নাজির হোসেন

দেহ্‌লবী ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং দিল্লীতে ঘোষনা করলেন, “এই সকল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হত্যা করা, তাদের মাল লুণ্ঠন করা বৈধ। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিধবা পত্নীদের ব্যবহার করা বৈধ।”

তাঁর সম্পর্কে আহলে হাদিস মৌলবী ফজলে হাসান বিহারী সাহেব লিখেছেন, “ডাঃ হাফিজ (যিনি মৌলবী নাযির হোসেন দেহলবী সাহেবের ঘনিষ্ট আত্মীয় ছিলেন) বলেছেন, বৃটিশ যুগে মিসজার লিসেন্স নামী এক আহত ইংরেজ মহিলাকে দেখতে পান এবং তাঁর এই অবস্থা দেখে প্রচুর কান্নাকাটি করেন এবং নিজের বাড়ীতে সেই মহিলাকে তুলে নিয়ে আসেন। তারপর তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর বাড়ীর মহিলাদিগকে সেই ইংরেজ মহিলাটিকে সেবা করার আদেশ দেন। এই সময় যদি কোনো বিদ্রোহী মুসলমান তাঁর এই অপকর্মের কথা জানতে পারতেন তাহলে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের সমস্ত লোকের প্রাণ (বিদ্রোহীদের হাতে শেষ হয়ে) যেত। এবং তাঁর গোষ্ঠীশুদ্ধ ধবংস হতে সামান্যও দেরি লাগত না। দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসার পর সেই বৃটিশ মহিলাকে মৌলবী নাযির হোসেন দেহলবী সাহেব ইংরেজদের প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দেন। যার ফল স্বরূপ তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের সকলকে সরকারের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। যাইহোক যখন বৃটিশ সরকার যখন পুরো শহর খানাতল্লাশী শুরু করে দেয় তখন কেবলমাত্র তাঁর (নাযির হোসেন) মহল্লা বৃটিশদের চামচাগিরির দরুণ বেঁচে যায়।” (আল হায়াত বা’দুল মামাত, পৃষ্ঠা-২৭৫-২৭৬)

লক্ষ্য করলে দেখা যায় গায়ের মুকাল্লিদিন মৌলবী নাযির হোসেন দেহলবী সাহেব যখন একজন আহত বৃটিশ মহিলাকে দেখলেন, তখন তাঁর মনে সেই মহিলার প্রতি দরদের বন্যা বয়ে যায় এবং তাঁকে বাঁচানোর জন্য পাগল প্রায় হয়ে পড়েন। মিঁয়া

নাযির হোসেন দেহলবী সাহেবের চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা শুরু হয়ে যায় তখন তিনি সেই আহত মহিলাকে নিজের বাড়ী উঠিয়ে নিয়ে আসেন এবং সেবা শুস্রসা করে সারিয়ে তুলেন।

অপরদিকে দেখা যায় মিঁয়া নাযির হোসেন দেহলবী সাহেবের চক্ষুর সম্মুখে হাজার হাজার মুসলমানকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হচ্ছে, উলামায়ে কেরামদিগকে শূকরের চামড়ার ভিতর ভরে জ্বলন্ত চুলার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। লাহোরের রাবী নদীতে প্রতিদিন ৪০জন আলেম নিক্ষেপ করা হচ্ছে, তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে পাশবিকতার ও বর্বরতার রেকর্ড কায়েম করা হচ্ছে। ম হিলাদের ইজ্জত ও আব্রু লুণ্ঠিত হচ্ছে এবং তাদের স্তন কেটে দেওয়া হচ্ছে, বৃদ্ধ এবং শিশুদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে, মুসলমানদেরকে কেটে তার লাশ গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে তখন মিঁয়া নাযির হোসেন দেহলবী সাহেবের চোখ দিয়ে সামান্যতমও অশ্রুধারা নির্গত হয় না। তখন তাঁর মন দেশের মানুষের জন্য, মুসলমান জাতির জন্য সামান্যও মন গলে না। আর একজন বৃটিশ মহিলার জন্য মিঁয়া সাহেবের মন দরদে ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় তাঁকে বাঁচানোর জন্য মিয়াঁ সাহেবের রক্ত শুকিয়ে যায় কিন্তু মুসলমানদের জন্য তাঁর মন একটুও কাঁদে না। আর কাঁদবেই বা কেন মিয়াঁ সাহেব তো বৃটিশদের চামচা যে ছিলেন। আর এই চামচাগিরির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় এবং তৎকালীন যুগে নগদ ১৩০০টাকা পুরস্কার দেওয়া হয় তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সরকারের পক্ষ থেকে 'শামসুল উলামা' খেতাবে ভূষিত করা হয়। (তথ্যসূত্র ঃ আহলে হাদিস আওর আংগ্রেজ)।

এখন যদি আহলে হাদিস দলের কোন লোক বলে, আমরা মিয়াঁ নাযির হোসেন দেহলবী সাহেবকে মানি না। আর মিয়াঁ নাযির হোসেন দেহলবী বৃটিশদের চামচাগিরি করলে আমাদের কি ? তাহলে আমরা উত্তরে বলব, এখন মিয়াঁ নাযির হোসেন দেহলবী বৃটিশদের পদলেহী ছিলেন এটা প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পর তাঁকে অস্বীকার করে পার পাওয়া যাবে না। কেননা, পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত আহলে হাদিস মাওলানা শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী সাহেব ‘হাদীসের ইতিবৃত্ত’ নামক বইটি মিয়াঁ নাযির হোসেন দেহলবী সাহেবের নামে উৎসর্গ করে লিখেছেন, “শতাব্দীর বিরল ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মতে যিনি ছিলেন হিজরীয় তের শতকে প্রায় সারা বিশ্বের শাইখুল হাদিস (১) এবং শাহ অলিউল্লাহ, শাহ আব্দুল আযীয ও শাহ ইসহাক দেহলভীর দরসে হাদীসের মসনদে বসে যিনি সুদীর্ঘ পঁচাত্তর বছর ধরে একশোরও বেশীবার বুখারী সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ পড়িয়ে সারা বিশ্বে সোয়া লাখেরও বেশী ছাত্র এবং আশী লাখের মত কুরআন ও হাদীস ভক্ত (২) রেখে অমরত্ব লাভ করেছেন সেই শাইখুল ফিল কুল আল্লামা সাইয়েদ নাযীর হুসায়ন মুহাদ্দিস দেহলভী (মৃত -১৯০২ ইং) ওরফে মিঞা সাহেব রহমাতুল্লা-হি আলাইহির রুহের শান্তি লাভের উদ্দেশ্যে এই বইটি আল্লাহ যুল ফাযলিল অযীমের দরবারে উৎসর্গিত হল।”

সুতরাং এখনও আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের আলেমরা মিঁয়া নাযির হোসেন দেহলবীকে নিজেদের বুযর্গ বলে মনে করেন। তাই এখন যদি কোন আহলে হাদিস দলের লোক মিঞা নাযির হোসেন দেহলবী সাহেবের বৃটিশদের চামচাগিরির কথা জানতে পেরে তাঁকে মানতে অস্বীকার করেন তাহলে তাঁদের এই অস্বীকার মোটেই গ্রহণযোগ্য হবে না। তার কারণ আইনুল বারী সাহেব তাঁর পুস্তক মিঞা নাযির হোসেন দেহলবীর

নামে উৎসর্গ করে প্রমাণ করে দিয়েছেন মিঞা সাহেব এখনও আহলে হাদিসদের কাছে সম্মানীয় ব্যক্তি।

সুতরাং ইতিহাস পাঠ করলেই দেখা যায় আহলে হাদিস আলেমরা কিভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চামচাগিরি করেছেন। কেবল মাত্র তাঁরা বৃটিশদের চামচাগিরিই করে যান নি তাঁরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জেহাদ করাকে হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন। আহ্লে হাদিশ ফিরকার মুখপাত্র মৌলবী মুহাম্মাদ হোসেন বাটালবী সাহেব লিখেছেন, "এই দল (আহলে হাদিস) সাত বছর ধরে উচিৎ পদ্ধতিতে বৃটিশ সরকারের সেবা করে আসছে। আসল মযহবে ইসলাম থেকে প্রমাণিত হয় যে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের সংগ্রাম করা এবং যারা সংগ্রাম করে তাদেরকে সাহায্য করা জায়েজ নয়।" (তথ্যসূত্র ঃ আহলে হাদিস আওর আংগ্রেজ)

তিনি আরও লিখেছেন, "বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কোনো ভারতীয় মুসলমানদের সংগ্রাম করা জায়েজ নয়।" তিনি তাঁর দলিলের স্বপক্ষে বলেন যে; "জেহাদের হাদিস মনসুখ হয়ে গেছে।"

মুহাম্মাদ হোসেন বাটালবী সাহেব আরও লিখেছেন, "ভরতবর্ষ যদিও খৃষ্টান শাসকের হাতে পরাধীন তথাপিও ভরতবর্ষকে দারুল ইসলাম মানতে হবে। কোন বাদশাহ্ চায় সে আরব, অনারব, মেহেদী সুডান, ইরানের শাহ্ সুলতান অথবা আমির খোরাসান হোক না কেন, ইংরেজের বিরুদ্ধে ধর্ম যুদ্ধ করা জায়েজ নয়।" (আল ইকতিসাদ ফি মাসায়েলিল জেহাদ, পৃঃ ২৫)

বিখ্যাত আহ্‌লে হাদিস মওলানা নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালী ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে ঘোষনা করে বলেন, “কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে খৃস্টানদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই এমন সময় ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ করা অনাসৃষ্টি বই কিছু নয়। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করা নাজায়েজ এবং হারাম। বৃটিশ সরকারের উচ্ছেদ কামনায় যারা লড়াই করছে তারা অবুঝ, অজ্ঞ এবং অদূরদর্শী।” (তথ্যসূত্র ঃ ইংরেজের তৈরী আহ্‌লে হাদিস ফির্‌কা, পৃঃ ৪, এম. এম. রশিদী)।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীও বৃটিশদের বিরুদ্ধে জেহাদ করাকে হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন। তিনিও বলেছেন, জেহাদের হাদিস মনসুখ হয়ে গেছে। তিনি তাঁর কবিতায় লিখেছেন,

ছোড় দো আয় দোস্তো জেহাদ কা খিয়াল,
দ্বীন মে হারাম হ্যয় জঙ্গ আওর কিতাল।।

তিনি আরও লিখেছন ঃ-

ক) কিছু কিছু আহম্মক এবং মূর্খ ব্যক্তি প্রশ্ন করে যে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা উচিৎ না উচিৎ নয়। মনে থাকে এই ধরণের প্রশ্ন করা একেবারেরই দুঃসাহসিকতার পরিচয়। কেননা, বৃটিশ সরকারের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব এবং ফরজ। সুতরাং জিহাদ করা জায়েজ নয়। জিহাদ হল হারামী এবং বদকার লোকের কাজ। (শাহাদাতুল কুরআন, পৃষ্ঠা-৩)

খ) প্রত্যেক ব্যক্তি যে আমার অনুসরণ করে এবং আমাকে মসীহ বলে মানে, তাকে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, বর্তমান যুগে বৃটিশদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা অকাট্য ভাবে হারাম। আমি আপনাদের কাছে এই আদেশ নিয়ে এসেছি যে, এখন থেকে অস্ত্রের দ্বারা জেহাদকে খতম করতে হবে। (জামিয়া রিসালায়ে জেহাদ, পৃষ্ঠা-৭-১৪)

গ) আমি বিগত ষোল বছর ধরে এই ব্যাপারে জোর দিচ্ছি যে, ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুসরণ করা ফরজ এবং জিহাদ করা হারাম। (তাবলিগে রিসালাত, খণ্ড- ৩০, পৃষ্ঠা-১৯৭)

ঘ) আজ থেকে দ্বীনের জন্য সংগ্রাম করা হারাম। এর পর থেকে যে দ্বীনের জন্য সংগ্রাম করার জন্য অস্ত্র ধারণ করবে, গাজী নাম ধারণ করবে, কাফিরদিগকে হত্যা করবে, সে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল(সাঃ) এর না-ফরমান ব্যক্তি। (তাবলিগে রিসালাত, খণ্ড- ৯, পৃষ্ঠা-৩৬)

ঙ) আমি বিশ্বাস করি যেরকম ভাবে আমার অনুসারীর সংখ্যা বাড়তে থাকবে ঠিক সেরকম জেহাদের মশলার পক্ষপাতীর সংখ্যাও কমতে থাকবে। কেননা, আমাকে ইমাম মেহেদী ও মসীহ মেনে নেওয়া আর জেহাদকে অস্বীকার করা এক। (তাবলিগে রিসালাত, খণ্ড- ৯, পৃষ্ঠা-১৫)

(চ) আমার জীবনের অধিকাংশ সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুসরণেই অতিবাহিত হয়েছে। আমি জেহাদের বিরুদ্ধাচারণ এবং ইংরেজদের অনুসরণের ব্যাপারে এতই গ্রন্থ

রচনা করেছি এবং রিসালা রচনা করেছি যে যদি সমস্ত গ্রন্থ এবং রিসালা যদি একত্রিত করা হয় তাহলে পঞ্চাশটি আলমারি পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। (তারিকাতুল কুলুব, পৃষ্ঠা-২৫/ তথ্যসূত্র-আহ্লে হাদিশ আওর আংগ্রেজ, পৃঃ ৯৭--৯৮)

সুতরাং দেখা যায় যে গায়ের মুকাল্লিদিন আহলে হাদিস ও কাদিয়ানি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তাঁদের উভয় দলের বক্তব্য বৃটিশদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা সম্পর্কে এক। উভয় দলই বৃটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন। আর তাঁরা বৃটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে হারাম বলে ফতোয়া দিবেন না কেন, তাঁরা বৃটিশদের চামচাগিরি যে করেছেন। আর এই চামচাগিরির প্রমাণ স্বরূপ বৃটিশদের বিরুদ্ধে জেহাদ করাকে হারাম ফতোয়া দিয়ে তাঁরা উভয় দলেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিমকহালালী ও ফরমান বরদারীর পরিচয় দিয়েছেন। আর একথা পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হয় যে, মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের গুরুদেব ছিলেন। একথা শুনে হয়ত কিছু কিছু আহলে হাদিস নামধারী মুখোশধারী আলেমের মনে চিড় ধরতে পারে যে, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী কিভাবে আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের গুরুদেব হতে পারেন ? তাহলে শুনুন, ‘মুজাদ্দিদে আযম’ কিতাবে লিখা আছে, ‘‘(আহলে হাদিস মৌলবী) মহম্মদ হোসেন বাটালবী যদিও তিনি উঁচু পর্যায়ের আলেম ও মুহাদ্দিস ছিলেন তিনি এতই গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানীর ইজ্জত ও এহতরাম করতেন যে তাঁর (কাদিয়ানীর) জুতো উঠিয়ে তাঁর সামনে সোজা। করে রেখে দিতেন এবং নিজের হাতে মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী সাহেবকে ওজু করানোকে নিজের সৌভাগ্য মনে করতেন।” (মুজাদ্দিদে আযম, পৃষ্ঠা-২২)

প্রিয় পাঠক লক্ষ করুণ, আহলে হাদিস দলের পেশওয়া মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেব মির্জা গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানী সাহেবকে এতই উঁচুতে উঠিয়ে দিলেন যে তাঁকে সলফে সালেহীনদের থেকেও উঁচুতে উঠিয়ে দিলেন। এবং তিনি মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেবের এতই অন্ধ ভক্ত ছিলেন যে তাঁর জুতো সোজা করানোকে এবং নিজের হাতে ওজু করানোকে নিজের সৌভাগ্য বলে মনে করতেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেবই বৃটিশ সরকারের কাছে আহলে হাদিস নামটি নিজেদের জন্য রেজেষ্ট্রী করিয়ে নেন।

তাহলে আমরা একথা জোরে শোরেই বলতে পারি গায়ের মুকাল্লিদিন আহলে হাদিস মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী তথা সমগ্র আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের গুরুদেব হলেন মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। আর মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ছাত্রই হলেন বর্তমান যুগের আহলে হাদিস সম্প্রদায়। আর ছাত্রই তো গুরুদেবের জুতো সোজা করার এবং গুরুদেবকে নিজের হাতে ওজু করিয়ে দেওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করেন।

তাহলে একথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে গায়ের মুকাল্লিদিন আহলে হাদিস ফিরকা ও কাদিয়ানী ধর্ম উভয় দলই সারা জীবন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চামচাগিরিতে লিপ্ত ছিলেন। এবং তাঁরা সারা জীবন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিমকহালালী ও ফরমাবরদারী করে গেছেন।

না তুম সদমে হমে দেতে, না যুঁ ফরিয়াদ হম করতে,
না খুলতে রাজ সর বস্তা, না যুঁ রুসওয়াইঁয়া হোতী।

সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে গায়ের মুকাল্লিদিন সম্প্রদায়ের জঘন্য আকিদা

তিরমিযী শরীফের হাদিসে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, আমার সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, এবং আমার পরে তাঁদেরকে নিশানা বানিয়ো না। যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালবাসে এবং তাঁদেরকে ভালবাসার দরুণ আমাকে ভালবাসে এবং যারা তাঁদেরকে ঘৃণা করার দরুণ আমাকে ঘৃণা করে। যে ব্যক্তি তাঁদেরকে কষ্ট দেয় সে যেন আমাকে কষ্ট দেয়। আর যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দেয় সে যেন আল্লাহকে কষ্ট দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে কষ্ট দেবে সে সময় খুবই নিকট যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পাকড়াও করবেন।

সহীহ মুসলিম শরীফের হাদিসে বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালমন্দ করবে না। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ উহুদ পাহাড় বরাবর স্বর্ণ ব্যয় করে, তবুও তাঁদের কারোর এক মুদ অথবা অর্ধ মুদের সমান হবে না।

এই সব হাদিস থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরামিদিগকে সম্মান করা ওয়াজীব। এবং তাঁদের সম্পর্কে বৈপরীত্য মনোভাব পোষণ করা সুস্পষ্টভাবে হারাম। মোল্লা আলী কারী হানাফী (রহঃ) তাঁর কিতাবে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর বানী নকল করে লিখেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ আয়ালাকে ভালবাসতে চায় তার

উচিৎ সে যেন আমাকে ভালবাসে, এবং যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসতে চায় তার উচিৎ সে যেন আমার সাহাবায়ে কেরামদিগকে ভালবাসে।

এইসব হাদিস থেকে সুপষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যার হৃদয়ে সাহাবায়ে কেরামদের আজমত ও ভালবাসা থাকবে না, তাদের ভাগ্যে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর ভালবাসা জুটবে না।

আল্লামা যাহাবী (রহঃ) তাঁর ‘রিসালা আল কবায়ের’ এর মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সম্পর্কে হযরত আনাস(রাঃ) এর রেওয়ায়েত নকল করে বলেছেন, হযরত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে নির্বাচিত করেছেন এবং আমার জন্য আমার সাহাবীদেরকে নির্বাচিত করেছেন এবং আল্লাহ তাঁদেরকে আমার ভাই এবং সাহায্যকারী বানিয়েছেন। আমার পর এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হবে যারা আমার সাহাবা সম্পর্কে বৈপরীত্য মনোভাব পোষণ করবে এবং তাঁদের দোষ ত্রুটি বর্ণনা করবে। তোমরা তাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া পানাহার করবে না। তাদের পরামর্শ নেবে না তাদের পরামর্শ দেবে না। তাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না। তাদের জানাযার নামাজ পড়বে না এবং তাদের সঙ্গে নামাজ পড়বে না।

সুতরাং উপরিউক্ত হাদিস থেকে দিবালোকের মতো পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, হুযুর (সাঃ) এর জামানার পরে এই উম্মতের মধ্যে একটি বাতিল ফিরকার সৃষ্টি হবে যে ফিরকা সাহাবায়ে কেরামদের দোষ ত্রুটি বর্ণনা করবে এবং তাঁদের প্রতি বৈপরীত্য মনোভাব পোষণ করবে তারা এই উম্মতের মধ্যে সব থেকে জঘন্য ফিরকা বলে বিবেচিত হবে। মুসলমানদের জন্য তাদের সঙ্গে উঠা বসা এবং তাদের সঙ্গে

কোনো রকমের সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম। তাদের সঙ্গে নামাজ পড়াও জায়েজ হবে না। যদিও সেই সাহাবায়ে কেরামদের শত্রুদের মধ্যে কেউ মারা যায় তাহলে তাদের জানাযায় নামাজ পড়াও জায়েজ হবে না।

সুতরাং এককথায় বলা যায়, সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কোনো রকমের কু-মনোভাব পোষণ করা সম্পূর্ণভাবে ইসলাম পরিপন্থী কাজ।

এখন আমরা দেখব আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে মনোভাব কি? যখন আমরা সাবাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের আকাবিরিন আলেম উলামাদের মনোভাব জানার চেষ্টা করি কিংবা তাদের আলেম উলামাদের কেতাবপত্র পড়াশুনা করি তাহলে দেখতে পাওয়া যায় যে তাদের আকিদা সাহাবা সম্পর্কে এতই জঘন্য যা সমগ্র উম্মতে মুসলিমার এবং আহলে সুন্নতুল জামাআতের বিপরীত। সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের জঘন্য শত্রু শিয়া ও রাফিজিরা যে আকিদা সাহাবা সম্পর্কে পোষণ করে বর্তমান যুগের ছোট রাফিজি অর্থাৎ গায়ের মুকাল্লিদিন আহলে হাদিস সম্প্রদায়ও সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে ঠিক সেই আকিদা পোষণ করে। বড় রাফিজিরা তো সাহাবাদের ঈমানে সন্দেহ করে আর ছোট রাফিজি অর্থাৎ গায়ের মুকাল্লিদরা সাহাবাদের আমলে সন্দেহ পোষণ করে থাকে। যা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে ইনশাল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে গায়ের মুকাল্লিদিনরা সেইসব বুলি আওড়িয়ে বেড়ায় যে বুলি শিয়া ও রাফিজি সম্প্রদায় আওড়িয়ে বেড়ায়। এমনকি কিছু কিছু সাহাবার নামের পাশে 'রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু' বলাকেও আহলে হাদিস আলেমরা জায়েজ বলে মনে করে না। যেমন গায়ের মুকাল্লিদিন জামাআতের ম শহুর আলেম ও মুহাদ্দিস নওযাব ওয়াহিদুজ্জামান সাহেব তাঁর নিজের বিখ্যাত

‘কানযুল হাকায়েক’ গ্রন্থে নিজেদের দলের আকিদা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, সাহাবায়ে কেরামদের পাশে ‘রাজিআল্লাহু তা আলা আনহু’ বলা উচিৎ, কিন্তু আবু সুফিয়ান, মুয়াবিয়া, উম্মর বিন আস, মুগিরা বিন শায়বা এবং উম্মর বিন জুনদুব প্রভৃতিদের পাশে ‘রাজিআল্লাহু আনহু’ বলা উচিৎ নয়।”

প্রিয় পাঠক লক্ষ্য করুন সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে এরকম ধরণের আকিদা হল শিয়া ও রাফিজিদের আকিদা। কোনো আহলে সুন্নতুল জামাআতের আকিদা নয়। এই এবারত আহ্লে হাদিস সম্প্রদায়ের বিখ্যাত আলেম নওয়াব ওয়াহীদুজ্জামান সাহেবের ‘কানযুল হিকায়েক’ গ্রন্থে আজও লিপিবদ্ধ রয়েছে। নওয়াব সাহেবের এই গ্রন্থ লেখা কয়েক যুগ অতিবাহিত হয়ে গেল এখনও পর্যন্ত কোনো গায়ের মুকাল্লিদিন আলেম এই এবারতের প্রতিবাদ করেন নি। সুতরাং বোঝা যায় এই আকিদা কেবলমাত্র নবাব ওয়াহিদুজ্জামান সাহেবের একা নয় বরং সমগ্র আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের আকিদা। এখন গায়ের মুকাল্লিদিনদের মধ্যে যদি কেউ এই এবারতকে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে তাহলে তার এই অস্বীকার মোটেই গ্রহণযোগ্য হবে না, কারণ, এই এবারতকে তাদের বড়রা অর্থাৎ আকাবিরিনরা দেখে শুনে চোখ বুজে হজম করে ফেলেছেন। আর যে বিষয় তাদের বড়রা চোখ বন্ধ করে হজম করে ফেলেছেন সে বিষয়ে ছোটদের অস্বীকার করার কোনো মানেই হয় না।

যাই হোক আহলে হাদিস আকবিরিন উলামাদের সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে যে কি জঘন্য আকিদা, তা নিচে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হল,

১) আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের আকিদা হল সাহাবাদের পরে জন্মগ্রহণ করেছেন এমন মুসলমান সাহাবাদের থেকেও বেশী মর্যাদাশালী এবং সম্মানের অধিকারী ছিলেন। যেমন, গায়ের মুকাল্লিনিদের অন্যতম মুখপাত্র এবং বিখ্যাত আলেম মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামন সাহেব লিখেছেন "খায়রুল কুরুনে কুরনী সুম্মাল্লাযীনা ইয়ালুনাহুম................."

এর অর্থ এই নয় যে পরবর্তীকালে আসবেন এমন মুসলমান আগের জামানার মুসলমানদের থেকে মর্যাদাবান হবেন না। সেই জন্য অনেক নবী করীম (সাঃ) এর উম্মতের মধ্যে মুতাখিরিন উলামা মুহাদ্দিসিন, ইলমে মারেফাত অর্জনকারী সুন্নতের পাবন্দী মুসলমানরা সাধারণ সাহাবাদের থেকে বেশী মর্যাদাবান ছিলেন, যা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারবে না।" (নজলুল আবরার, পৃষ্ঠা-৯০)

মা আজাল্লাহ! সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে এরকম জঘন্য আকিদা আহলে সুন্নতুল জামাআতের কোনো মুসলমানের হতে পারে না। আহলে সুন্নতুল জামাআতের সমগ্র মুসলমানের আকিদা হল, একজন নবী যতই মর্যাদাবান হোক না কেন, আল্লাহর সমতুল্য কখনই হতে পারবেন না, আর একজন সাহাবী যতই মর্যাদাবান হোক না কেন কোনো নবীর সমতুল্য হতে পারবেন না আর একজন ওলী যতই মর্তবাশীল ও উঁচু পর্যায়ের ওলী হোন না কেন, একজন আদনা দরজার সাহাবীর সমতুল্য কখনই হতে পারেন না। (বেহেস্তী জেওর, মওলানা আশরাফ আলী থানবী)

আর এখানে গায়ের মুকাল্লিদিনদের মাওলানা ওয়াহীদুজ্জামান সাহেবের বক্তব্য দেখুন, তিনি সাহাবীদের পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণকারী মর্যাদাশালী উলামা এবং মুহার্সিনদেরকে

কেবলমাত্র সাহাবীদের সমতুল্যই বললেন না বরং তিনি সাহাবীদের থেকে তাঁদের ম র্যাদা বাড়িয়ে দিলেন। (নাউযুবিল্লাহে মিন যালেক) সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে এরকম জঘন্য ও মারাত্মক আকিদা কেবলমাত্র গায়ের মুকাল্লিদিন ছাড়া আর কার হতে পারে ?

২) গায়ের মুকাল্লিদিনদের এটাও আকিদা হল যে ইমাম মেহেদী (রহঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ) থেকে বেশী মর্যাদাবান। যেমন, নওয়াব ওয়াহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন----"তদন্ত করলে দেখা যায় সাহাবীরা হুজুর (সাঃ) এর ফযিলত অর্জন করেছিলেন যা আওলিয়ায়ে কেরামরা অর্জন করেননি। আর এটাও সম্ভব যে আওলিয়ায়ে কেরামরা অন্যান্য ফজিলত অর্জন করেছিলেন যা সাহাবীরা অর্জন করতে পারেন নি। যেমন আল্লামা ইবনে শিরীন (রহঃ) এর মরফু সনদ থেকে প্রমাণিত যে আমাদের ইমাম মেহেদী (রহঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ) এর থেকে বেশী মর্যাদাবান ছিলেন।" (নজলুল আবরার, পৃষ্ঠা-৯০)

আহলে সুন্নতুল জামাআতের কোনো দলিল থেকে এটা প্রমাণিত নয় যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ও হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর থেকে হযরত ইমাম মেহেদী (রহঃ) বেশী মর্যাদাবান ছিলেন। এটা কেবলমাত্র আহলে হাদিসদেরই আকিদা।

৩) আহলে হাদিসদের মযহব হল জুম্মার খুতবায় খুলাফায়ে রাশেদীনদের নাম নেওয়া বিদআত। যেমন নওয়াব ওয়াহিদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন, "আহলে হাদিস খুলাফায়ে রাশেদীন ও সুলতানদের জুম্মার খুতবায় তাদের নাম নেওয়াকে স্বীকার করে

না। তার কারণ এটা বিদআত। আর হুজুর (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে এটা প্রমাণিত নয়।” (নজলুল আবরার, পৃষ্ঠা-৯০)

(৪) আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের মযহব ও আকিদা হল, সাহাবায়ে কেরামদের কথা দ্বীন ও শরীয়াতের দলীল নয়। যেমন মিঁয়া নাজির হোসেন দেহলবী লিখেছেন, “যদি হযরত আব্দুল্লাহ বিন আস এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর প্রভৃতিদের ফতোয়া যদি সঠিকও হয় তবুও তাদের থেকে দলীল নেওয়া উচিৎ নয়। তার কারণ, সাহাবীদের কথা দলীল নয়।” (ফতোয়ায়ে নাযিরিয়া, পৃষ্ঠা-৩৪০)

৫) আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের আকাবিরিন উলামারা খুলাফায়ে রাশেদীনদেরকে এবং খাস করে হযরত ফারুকে আজম উমর (রাঃ) কে জঘন্যভাবে তাদের কিতাবে আক্রমণ করেছেন। এবং তাঁর ব্যক্তিত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সেই সব ভাষার ব্যবহার করেছেন যে ভাষা হযরত উমর (রাঃ) এর জন্য মুসলিম মিল্লাতের অন্যতম শত্রু শিয়া সম্প্রদায় করে থাকে। দুই সম্প্রদায়ই হযরত উমর (রাঃ) কে মারাত্মকভাবে গালিগালাজ করে থাকে। পার্থক্য কেবল এটাই তারা দুই সম্প্রদায়ের উমর (রাঃ) কে গলি দেওয়ার ভঙ্গিটা আলাদা। যেমন, গায়ের মুকাল্লিদিনদের মশহুর আলেম মাওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ী সাহেব লিখেছেন, “অনেক সাফ সাফ মোটা মোটা এমন মাশায়েল আছে যেখানে হযরত ফারুকে আজম উমর (রাঃ) ভুল করেছেন। আমরা এবং আপনারা সবাই একমত যে সেইসব মশায়েল গুলি উমর (রাঃ) একেবারেই জানতেন না।” (তারিখে মুহাম্মদী, পৃষ্ঠা-৪১)

আল্লাহু আকবার! আহলে হাদিসদের মধ্যে এমন আলেমও রয়েছেন যাঁরা হযরত উমর (রাঃ) এর মত জবরদস্ত সাহাবীর দ্বীনি এবং শরীয়াতী মশলার ভুল ধরার ক্ষমতা রাখেন।

৬) জামেয়া সালফি বেনারসের গায়ের মুকাল্লিদিন আলেম রাইস আহমাদ নাদভী হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) এর শানে বেয়াদবী সূচক লিখেছেন, "কোরআন মজিদের দুটি আয়াত এবং পঞ্চাশ হাদিশের দ্বারা প্রমাণিত যে তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ পড়া জায়েজ। হযরত উমর ও হযরত ইবনে মসউদের সামনে এই আয়াত এবং হাদিস পেশ করা হয়েছিল, তবুও তাঁরা বুঝতে পারেন নি।" (তানবিরুল আফাক, পৃষ্ঠা-৪১৭)

৭) হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলি (রাঃ) এক মজলিস তিন তালাক দেওয়াকে তিন বলে ফতোয়া দিয়েছেন। এই ফতোয়াকে অস্বীকার করতে গিয়ে গায়ের মুকাল্লিদ আলেম রইস নাদভী লিখেছেন, "এটা প্রকাশ্য যে হযরত আলী (রাঃ) এক মজলিসে তিন তালাকের ফতোয়া রাগের মাথায় দিয়েছেন.....এই ক্রোধান্বিত ব্যাপার সেই সব সাহাবীদের মধ্যে মওজুদ ছিল যাঁরা এক মজলিসে তিন তালাককে তিন বলে ফতোয়া দিয়েছেন।" (তানবিরুল আফাক, পৃষ্ঠা-১০৩)

তিনি আরও লিখেছেন, "এটা প্রকাশ্য যে রাগের মাথায় সাহাবীরা যে ফতোয়া দিয়েছেন সেগুলি শরীয়াতী দলীল নয়। তার কারণ নবী ছাড়া অন্য কারোর বানী শরীয়াতী দলীল নয় যা শরীয়াতের খেলাফ।" (তানবিরুল আফাক, পৃষ্ঠা-১০৩)

৮) আহলে হাদিস জামেয়া সালফিয়ার মুহাক্কিক আলেম রইস নাদভী তাঁর কিতাব ‘তানবিরুল আফাক’--এর মধ্যে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর জলিলুল কাদির সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) এর শানে মারাত্মক হামলা করে লিখেছেন, “কেননা ইবনে মসউদের বায়ান রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর বর্নণা উসুল এবং শরীয়াতের খেলাফ। সেজন্য প্রকাশ্যভাবে ইবনে মসউদের বর্নণা শরীয়াতে গ্রহণযোগ্য নয়।” (তানবিরুল আফাক, পৃষ্ঠা-১৬৫)

৯) আহলে হাদিশ সম্প্রদায়ের আকিদা হল, সাহাবা এবং তাবেয়ীনগণ কোরআন শরীফের বিরোধী কাজ করতেন। তাঁদের কেতাব ‘তানবিরুল আফাকে’র মধ্যে লেখা আছে, “অনেক সাহাবা এবং তাবেয়ীন কোরআন শরীফের অনেক আয়াতের খবর রাখতেন এবং তেলাওয়াত করতেন। তা সত্বেও বিভিন্ন কারণে সেই আয়াতের বিরোধী কাজ করতেন।” (তানবিরুল আফাক, পৃষ্ঠা-৪৫)

কোরআন শরীফের আয়াতের জ্ঞান ও খবর রাখা সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরামরা সেই আয়াতের বিরোধী কাজ করতেন এটা হল মুসলিম সম্প্রদায়ের জঘন্য শত্রু শিয়া সম্প্রদায়ের আকিদা। শিয়ারা সাহাবা সম্পর্কে যা কথা তাদের কেতাবে লিখেছে ঠিক সেই কথায় আহলে হাদিস সম্প্রদায় আজ তাদের কিতাবে লিখে চলেছে। এক কথায় শিয়া ও রাফেজী সম্প্রদায় সাহাবা সম্পর্কে যেসব আকিদা পোষণ করে, বর্তমান যুগের ছোট রাফেজী অর্থাৎ আহলে হাদিস সম্প্রদায়ও সাহাবা সম্পর্কে ঠিক সেই আকিদাই পোষণ করে।

১০) হাকিম ফায়েজ আলম সিদ্দিকি আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের একজন জবরদস্ত আলেম ছিলেন। তিনি আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের কাছে ‘বে নজীর মুহাক্কিক’ নামে পরিচিত। জনাব হাকিম ফয়েজ আলম সিদ্দিকি সাহেব তাঁর কিতাব ‘সিদ্দিক কায়েনাত’ এর মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) কে মারাত্মকভাবে হামলা করতে গিয়ে লিখেছেন,“তাঁকে বঅর্থাৎ আলী (রাঃ) কেম উম্মত (মুসলমানরা) খলিফা নির্বাচন করেন নি। তিনি দুনিয়ার নির্বাচিত খলিফা ছিলেন, সেজন্য তাঁর অত্যাচারী মুলক চার পাঁচ বছর শাসনকালে মুসলমানদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব ছিল। সেজন্য এক লাখের অধিক তৌহিদবাদী মুসলমান তাঁর অত্যাচারে শেষ হয়ে গেছে। তাঁর শাহাদাত সমগ্র মুসলিম জাহানের জন্য এক রহমত স্বরূপ।” (সিদ্দিকে কায়েনাত, পৃষ্ঠা-২২৭)

তিনি আরও লিখেছেন, “সমগ্র মুসলিম জাহান চার পাঁচ বছর বঅর্থাৎ আলী (রাঃ) এর এন্তেকালের পরম পর শান্তির নিঃশ্বাস নিয়েছেন।” (সিদ্দিকে কায়েনাত, পৃষ্ঠা-২২৭)

অর্থাৎ হজরত আলী (রাঃ) চার-পাঁচ বছরের খেলাফত কাল আহ্লে হাদিস ওলামা ফায়েজ আলম সিদ্দিকীর নিকট মুসলমানদের জন্য আজাব ছিল (নাউজো বিল্লাহি মিন জালেক)

(১১) হাকিম ফায়েজ আলম সিদ্দিকি সাহেব তাঁর কিতাবে হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ) সম্পর্কে লিখেছেন, “তিনি (অর্থাৎ ইমাম হোসেন) বাস্তবে বরসাম (এক ধরণের রোগ) এর রোগী ছিলেন। সাধারণতঃ এই রোগের রোগীরা মারা যায় তা না হয়

পাগল হয়ে যায়। যদি কেউ এই রোগ থেকে বেঁচেও যায় তাহলে সে বোবা হয়ে যায় এবং তার মস্তিষ্ক চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলে।” (খেলাফতে রাশিদা, পৃষ্ঠা-১৩৭)

প্রিয় পাঠক বুকে হাত দিয়ে বলুন ! যাঁরা ইমাম হোসেন (রাঃ) সম্পর্কে এরকম আকিদা রাখে যে তিনি বরসাম রোগের রোগী ছিলেন এবং নাউজুবিল্লাহ পাগল ছিলেন তাঁরা কিভাবে নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করতে পারে ? আমি বিশ্বাস করি যার অন্তরে সামান্য পরিমাণ ও ঈমানের অংশ বাকী থাকবে সে ব্যক্তি কোনোদিন এরকম ধরণের কথা বলতে পারবে না। ভাবলে অবাক লাগে আহলে হাদিসরা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে এত জঘন্য আকিদা রাখার পর নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে কোন মুখে?

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর গায়ের মুকাল্লিদরা যদি একত্রিত হয়ে যায় তবুও হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ) কে পাগল ও বরসাম রোগের রোগী বলে প্রমাণ করতে পারবে না।

(১২) হযরত হুযাইফা (রাঃ) একজন জবরদস্ত সাহাবী ছিলেন। তিনি আল্লাহর রাসুল (সাঃ) সম্পর্কে এমন কথা জানতেন যা অন্যান্য সাহাবীরা জানতেন না এবং সাহাবাদের মধ্যে তাঁর এক বিশেষ স্থান ছিল। হযরত হুযাইফা (রাঃ) সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “হুযাইফা যা তোমাদের সামনে বর্ণনা করবে তা তোমরা সত্য বলে মনে করবে।” (তিরমিযী শরীফ)

সেই হযরত হুযাইফা (রাঃ) সম্পর্কে গায়ের মুকাল্লিদ আলেম হাকিম ফায়েজ আলম সিদ্দিকি সাহেব মনে করেন যে তিনি হযরত উমর (রাঃ) এর হত্যার চক্রান্তে অংশীদার ছিলেন।

হাকিম ফায়েজ আলম সিদ্দিকি সাহেব তাঁর কিতাবে লিখেছেন, "হুযাইফা (রাঃ) এর এই কথা থেকে কি বোঝা যাচ্ছে না যে তিনি এই চক্রান্তের ব্যাপারে অবগত ছিলেন। আর যদি এই চক্রান্ত কেবল মাত্র ইহুদি ও অগ্নিপূজকদের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল, তাহলে হুযাইফা (রাঃ)কে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করার ব্যাপারে কোন বিষয় প্রতিবন্ধক ছিল ? এই হুযাইফার পুত্র মহম্মদ ও মহম্মদ বিন আবুবকর মিশরের ইবনে সাবার বিশেষ অনুগত ব্যক্তি ছিল।" (শাহাদাতে জিন্নুরায়িন, পৃষ্ঠা-৭১)

এখানে হাকিম ফায়েজ আলম সিদ্দিকি সাহেব বলতে চেয়েছেন যে হযরত উমর (রাঃ)এর শাহাদাতে হযরত আবু হুযাইফা (রাঃ) এবং তাঁর দুই পুত্র অংশীদার ছিলেন। (তথ্যসূত্র- সাহাবায়ে কেরাম কে বারে মে গায়ের মুকাল্লিদিন কা নুকতা নযর, লেখক-মহম্মদ আবুবকর গাজীপুরী)

১৩) আহলে হাদিস দলের আদি পিতা আব্দুল হক বেনারসী বলেছেন, "হজরত আলী (রাঃ) এর সঙ্গে যুদ্ধ করে হজরত আয়েশা (রাঃ) মুরতাদ (ইসলাম থেকে খারিজ) হয়ে গিয়েছিলেন। যদি তওবা না করে মারা যান তাহলে কাফের হয়ে মারা গেছেন।" (কাশফুল হিজাব, ২১ পৃষ্ঠা, হাওয়ালা আইনা-ই-গায়ের মোকাল্লিদিয়াত, পৃষ্ঠা-২৩৯)

মাজাল্লাহ! হজরত উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে এরকম আকিদা একমাত্র গায়ের মুকাল্লিদদেরই হতে পারে। আহলে সুন্নতুল জামাআতের কোন মুসলমানের হতে পারে না। আম্মা আয়েশা (রাঃ) কে মুরতাদ একমাত্র শিয়ারাই বলে। যেমন, শিয়াদের ইমাম বাকের বলেন, 'মাত্র তিনজন সাহাবা মুসলমান ছিলেন, (১) আবু জর, ২) মেকদাদ ও ৩) সালমান ফারসী। এই তিনজন ছাড়া সকলেই মোরতাদ অর্থাৎ ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছিলেন।" (তাফসীরে ছাফী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা--৩৮৯)

শিয়াদের 'তাকবীবুল মা আরেফ' নামক কিতাবে আছে, হজরত জয়নুল আবেদীনকে তার আজাদকৃত গোলাম জিজ্ঞাসা করেছিল, হজরত আবু বকর সিদ্দিক ও হজরত উমার কেমন ব্যক্তি ছিলেন ? উত্তরে তিনি বলেন ঐ দুই জনেই কাফের হয়ে গিয়েছিলেন। যারা ঐ দুজনকে ভালবাসবে, তারাও কাফের।

সুতরাং এখানে বুঝা গেল শিয়া অর্থাৎ বড় রাফিজি এবং আহলে হাদিস অর্থাৎ ছোট রাফিজিদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আকিদা গত দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। নীতিগতভাবে তারা উভয়ই এক। তারা এতই বেয়াদব ও সাহাবাদের গুস্তাখ যে তারা আয়েশা (রাঃ) কেও মুরতাদ বলতে বাদ দেয় না।

প্রিয় পাঠক! নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করে বলুন সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে এরকম জঘন্য মনোভাব কি কোনো ঈমানদার মুসলমানের হতে পারে ? কোনোদিনই হতে পারে না। তাই আমরা জোর গলায় বলব এই পৃথিবীর বুকে আহলে হাদিস সম্প্রদায় যতই হাদিস হাদিস করে চিৎকার করুক না কেন, আর নিজেদেরকে যতই আহলে

হাদিস, আহলে তওহীদ, আহলে হক্ব এবং সত্যের পূজারী বলে, দুনিয়া জুড়ে আস্ফালন করুক না কেন, সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে এরকম জঘন্য আকিদা পোষণ করার পর তারা কোনোদিনই নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রমাণ করতে পারবে না।

আর আহলে হাদিস সম্প্রদায় যতই নিজেদেরকে আহলে সুন্নতুল জামাআতের অনুসারী বলে দাবী করুক না কেন কিয়ামত পর্যন্ত তারা নিজেদের আহলে সুন্নতুল জামাআতের অনুসারী বলে প্রমাণ করতে পারবে না। তার কারণ, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "বনি ইস্রাইলের জাতি একাত্তরটি দলে ভাগ হয়েছিল তাদের মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সবগুলি দোজখে যাবে। আর আমার উম্মত তিয়াত্তরটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি দল ছাড়া সবগুলি দোজখে যাবে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ)! সেই একটি দল কেমন হবে? তিনি বললেন, যারা আমার এবং আমার সাহাবীদের পথ অনুসরণ করবে।"

আর আহলে হাদিস সম্প্রদায় সাহাবীদের পথ অনুসরণ ত দূরের কথা তারা যেভাবে সাহাবায়ে কেরামদিগকে গালিগালাজ ও সমালোচনার শিকার বানিয়েছে তাতে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় তারা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবাদের পথে প্রতিষ্ঠিত নয় তারা বাহাত্তর ফিরকার অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যে বাহাত্তরটি জাহান্নামী দলের বিবরণ দিয়েছেন আহলে হাদিস সম্প্রদায় সেই বাহাত্তর জাহান্নামী দলের অন্তর্ভূক্ত।

আহলে হাদিস সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ভবিষ্যৎবাণী

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এই আহলে হাদিস দল সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন এবং তাদের দল থেকে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে সাবধান করে গেছেন।

হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, ***"আন আবি হুরাইরাতা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু কালা, কালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইয়াকুনু ফি আখরিজ্জামানি দাজ্জালুনা কাজ্জাবুনা ইয়াতুনাকুম মিনাল আহাদিসি বিমা লাম তাসমাহু আনতুম ওয়ালা আবাহুকুম ফাহিয়াকুম ওহিয়াহুম লা য়ুযুল্লুনাকুম ওয়ালা ইয়াফতিনুনাকুম।"***

অর্থাৎ "হযরত আবু হুরাইয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুললাহ (সাঃ) বলেছেন, শেষ যুগে একদল দাজ্জাল শ্রেণীর মিথ্যাবাদী দলের আবির্ভাব হবে যারা মানুষকে হাদিসের দিকে আহ্বান করবে। তারা এমন এমন হাদিস শোনাবে যা তোমাদের বাপ দাদার মধ্যে কেউ কোনোদিন শোনেনি। তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকবে এবং তাদেরকে নিজেদের সংস্পর্শে থেকে দূরে রাখবে।" (মুসলীম শরীফ)

তাই দেখা যায় আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এই আহলে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদিন ফিৎনা সম্পর্কে আমাদেরকে বহু আগেই ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন এবং তাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার কথা বলে গেছেন। সুতরাং আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর হুকুম পালন করতঃ এই গায়ের মুকাল্লিদ্দিন নামক মারাত্মক ফিৎনাবাজ দলের সংস্পর্শ থেকে সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদের তাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা উচিৎ।

আহলে কুরআন ও আহলে হাদিস উভয় দলের যুক্তি এক

আহলে কুরআন ও আহলে হাদিস উভয় দলের যুক্তি হল একই ধরণের। আহলে কুরআন সম্প্রদায় হল এমন এক মারাত্মক সম্প্রদায় যারা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদিসকে মানে না এবং তারা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সমগ্র হাদিসকে মিথ্যা বলে জানে। আর আহলে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ও হল এমন এক মারাত্মক সম্প্রদায় যারা আয়েম্মায়ে মুজতাহিদিনদের ফিকাহকে মানে না এবং তারা আয়েম্মায়ে মুজতাহিদিনদের সমগ্র ফিকাহকে মিথ্যা বলে জানে। আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে আহলে কুরআন সম্প্রদায় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদিসকে অস্বীকার করার জন্য যেসব যুক্তি পেশ করে ঠিক সেরকম গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ও আয়েম্মায়ে মুজতাহিদিনদের ফেকাহকে অস্বীকার করার জন্য সেইসব যুক্তি তারা পেশ করে।

আহলে কুরআন ও আহলে হাদিস উভয় সম্প্রদায় তারা তাদের স্বপক্ষে যেসব যুক্তি পেশ করে থাকে সেগুলি নিচে ছকের আকারে বর্ণনা করা হল;

আহলে কুরআন ও আহলে হাদিস উভয় দলের যুক্তির সাদৃশ্যের তালিকা

আহ্লে কুরআনদের যুক্তি	আহ্লে হাদিসদের যুক্তি
১) আহলে কুরআন দলের লোকেরা বলে, কুরআন শরীফ হল আল্লাহর পরিপূর্ণ গ্রন্থ এবং কুর আন শরীফে সমস্ত কিছুই আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুতরাং কুরআন শরীফ আমাদের কাছে থাকার পর হাদিসের প্রয়োজন নেই।	১) আহলে হাদিস দলের লোকেরা বলে, কোরআন শরীফ হল আল্লাহর বাণী ও হাদিস শরীফ হল রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর বানী, কোরআন শরীফে ও হাদিস শরীফে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল(সাঃ) সমস্ত কিছুই বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুতরাং কোরআন শরীফ ও হাদিস শরীফ আমাদের কাছে থাকার পর আয়েম্মায়ে মুজতাহিদিনদের ফিকাহের কোনো প্রয়োজন নেই।
২) আহলে কোরআন দলের লোকেরা বলে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর এন্তেকালের দুইশত বছর পর হাদিসের সমস্ত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে যেসব	২) আহলে হাদিস দলের লোকেরা বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এন্তেকালের কয়েক শত বছর পর তাঁর ফিকাহ গ্রন্থ আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সুতরাং

হাদিস লিপিবদ্ধ আকারে সংরক্ষিত রয়েছে সেইসব হাদিসের সাথে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।	বর্তমানে যেসব ফিকাহ লিপিবদ্ধ আকারে সংরক্ষিত রয়েছে সেইসব ফিকাহ ইমাম আবু হানিফার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।
৩) আহলে কুরআন দলের লোকেরা বলে, হাদিস হল কোর আনের বিপরীত। উদাহরণ স্বরূপ তারা বলে, কোরআন শরীফে লেখা আছে, ইব্রাহীম(আঃ) আল্লাহর সত্যবাদী নবী ছিলেন, আর বুখারী শরীফে লেখা আছে, ইব্রাহীম (আঃ) তিনটি মিথ্যাকথা বলেছিলেন। সুতরাং বুখারী শরীফ হল কোরআন শরীফের বিপরীত।	৩)আহলে হাদিস দলের লোকেরা বলে, ফিকাহ হল হাদিসের বিপরীত। উদাহরণ স্বরূপ তারা বলে, হাদিসে আট রাকাত তারাবীহর নামাজ পড়ার কথা বলা হয়েছে, আর ফিকাহ গ্রন্থে কুড়ি রাকাত তারাবীহর নামাজ পড়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং ফিকাহ হল হাদিস শরীফের বিপরীত।
৪) আহলে কোরআন দলের লোকেরা বলে, হাদিস যদি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হত তাহলে হাদিসগুলি একে অপরের পরস্পর	৪) আহলে হাদিস দলের লোকেরা বলে, হানাফী মজহব যদি সত্য হত তাহলে হানাফী মজহাবে এত পরস্পর বিরোধী হত না।

বিরোধী হত না। এক হাদিস বলে রফে ইদাইন করো, অন্য হাদিসে বলে, রফে ইদাইন করবে না, এক হাদিস বলে, ঐ ব্যক্তির নামায হয় না যে ব্যক্তি সুরা ফাতেহা পড়ে না, অন্য হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাত পড়ে তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেওয়া উচিৎ যাতে সে আর পড়তে না পারে। হাদিসের মধ্যে এই পরস্পর বিরোধী মন্তব্য থেকে প্রমাণ হয় এগুলি নবীর বাণী নয়। তাই তারা হাদিস মানে না।	ইমাম আবু হানিফার মতে, যে কোনো ভাষায় নামাযের সুরা (কিরাআত) পড়লে নামাজ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের নিকট তা হবে না। ইমাম আবু হানিফার মতে রোগ মুক্তির জন্য হারাম জানোয়ারের প্রসাব পান করা হারাম। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের নিকট হালাল। সুতরাং ফিকাহের মধ্যে এই পরস্পর বিরোধী মন্তব্য থেকে প্রমাণ হয় এগুলি ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম ইউসুফ এর বাণী নয়। তাই তারা ফিকাহ মানে না।
৫) আহলে কোরআন দলের লোকেরা বলে, কোরআন হল আল্লাহর বাণী, আর হাদিস হল নবীর বাণী। আর আল্লাহ হলেন	৫) আহলে হাদিস দলের লোকেরা বলেন, আল্লাহর নবী (সাঃ) হলেন আল্লাহর পয়গম্বর আয়েম্মায়ে মুজতাহিদিনরা হলেন

খালেক (সৃষ্টিকর্তা) এবং নবী হলেন মখলুক (সৃষ্টি), আর আল্লাহর বাণী অর্থাৎ কোরআন শরীফ মওজুদ থাকার পর যদি নবী করিম (সাঃ) এর কথা মানা হয় তাহলে সেটা শিরক ফিদ তওহীদ হবে। সেই জন্য তারা কোরআন থাকার পর হাদিস মানে না।	উম্মতি। আর নবীর বাণী অর্থাৎ হাদিস শরীফ মওজুদ থাকার পর যদি উম্মতির কথা মানা হয় তাহলে সেটা শিরক ফির রিসালাত হবে। সেই জন্য তারা আয়েম্মায়ে মুজ্তাহিদিনদের ফিকাহকে মানে না।
৬) আহলে কোরআন দলের লোকেরা বলে, বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, মিশকাত শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফ, তিরমিযী শরীফ, নাশাঈ শরীফ, বাইহাকী শরীফ, আহমদ শরীফ,. মুসনাদে আহমদ, মুসনদে আবু হানিফা, ত্বাহাবী শরীফ, মুয়াত্বা ইমাম মুহাম্মদ, মুয়াত্বা ইমাম মালেক, মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক, মুসনাদে হুমাইদি প্রভৃতি যেসব হাদিসের গ্রন্থগুলি রয়েছে	৬) আহলে হাদিস দলের লোকেরা বলে, হেদায়া, কুদুরী, শরহে বেকায়া, ফতোয়া আলমগিরি, ফতোয়ায়ে শামী প্রভৃতি যেসব ফিকাহ গ্রন্থগুলি রয়েছে সেগুলির মধ্যে কোনো ফতোয়ার কেতাব কোনো সাহাবায়ে কেরাম পড়ে যান নি। সেজন্য তারা এই সমস্ত ফিকাহের কেতাবগুলিকে মানে না।

সেগুলি কোনো সাহাবী পড়ে যান নি। সেজন্য তারা হাদিসের কেতাবগুলিকে মানে না।	
৭) আহলে কোরআন দলের লোকেরা বলে, যখন থেকে পৃথিবীতে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে তখন থেকে আহলে কোর আন দলের উৎপত্তি হয়েছে।	৭) আহলে হাদিস দলের লোকেরা বলে, যখন থেকে পৃথিবীতে হাদিসের উৎপত্তি হয়েছে তখন থেকে আহলে হাদিস দলের উৎপত্তি হয়েছে।

সুতরাং উপরের তালিকা থেকে পরিষ্কার প্রমাণ হয়ে গেল, আহলে কোরআন সম্প্রদায় হাদিস শরীফকে অস্বীকার করার জন্য যেসব যুক্তি আওড়িয়ে বেড়ায় আহলে হাদিস সম্প্রদায়ও ফিকাহ শাস্ত্রকে অস্বীকার করার জন্য ঠিক সেইসব যুক্তি আউড়িয়ে বেড়ায়। সুতরাং যুক্তিগতভাবে উভয় দলের মন্তব্য এক।

যদি হিম্মৎ হয় তবে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন

আহলে কোরআন সম্প্রদায়রা বলে, যেদিন পৃথিবীতে কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে সেদিন থেকেই আহলে কোরআন দলের উৎপত্তি হয়েছে। আর আহলে হাদিসরা বলে, যেদিন থেকে হাদিস শরীফের উৎপত্তি হয়েছে সেদিন থেকে আহলে হাদিস দলের উৎপত্তি হয়েছে। উভয় দলই তাদের নিজেদের দাবীতে অটল। অথচ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আহলে কোরআন ও আহলে হাদিস উভয় দলই

হল চরম মিথ্যাবাদী। বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষে আসার আগে আহলে কোরআন ও আহলে হাদিস দলের কোনো টিকিও পর্যন্ত এদেশে খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমাদের সমগ্র আহলে সুন্নতুল জামাআতের তরফ থেকে আহলে কোরআন ও আহলে হাদিস উভয় দলকে চ্যালেঞ্জ রইল, ভারতবর্ষে বৃটিশদের আগমণের পূর্বে তাদের কোনো মাদ্রাসা, খানকা, মসজিদ বা তাদের নির্মিত কোনো অট্টালিকা দেখিয়ে দিক। মাদ্রাসা, মসজিদ, খানকা ত দূরের কথা বৃটিশরা ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বে তাদের নির্মিত কোনো পায়খানা ঘরও দেখাতে পারবে না।

অথচ আমাদের আহলে সুন্নতুল জামাআত হানাফী মযহাবের ভারতবর্ষে বৃটিশরা আগমণের পূর্ব থেকে প্রচুর মাদ্রাসা, খানকা, মসজিদ, অট্টালিকা বিদ্যমান। দিল্লীর জামে মসজিদ, পাকিস্তানের লাহোরের জামে মসজিদ, অযোধ্যার বাবরী মসজিদ, বৃটিশরা ভারতবর্ষে আসার আগে থেকেই বিদ্যামান। দিল্লীর লালকেল্লা, কুতুবমিনার, আগ্রার তাজমহল প্রভৃতিগুলি বৃটিশরা ভারতবর্ষে আসার আগে থেকেই বিদ্যমান।

অপর দিকে দেখা যায়, ভারতবর্ষে বৃটিশরা আগমণের পূর্বে আহলে কোরআন ও আহলে হাদিস দলের কোনো লিখিত গ্রন্থ নেই। তাদের লিখিত কোনো কোরআন শরীফের তফসির, হাদিস শরীফের শারাহ, বা কোনো মাশআলা মশায়েলের গ্রন্থ নেই। অথচ আমাদের আহলে সুন্নতুল জামাতের হানাফী মযহাবের লিখিত গ্রন্থ যেমন হেদায়া, কুদুরী, শরহে বেকায়া, ফতোয়ায়ে আলমগিরি, ফতোয়ায়ে শামী প্রভৃতি ফিকাহ গ্রন্থগুলি বৃটিশরা ভারতবর্ষে আসার বহু আগেই রচিত হয়েছে। অপরদিকে আরও দেখা যায়, ভারতবর্ষে বৃটিশরা আসার আগে আহলে কোরআন ও আহলে হাদিস

সম্প্রদায়ের কোনো আলেমের নামগন্ধও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাদের দল সম্পর্কে কোনো বর্ণনা, বৃটিশরা ভারতবর্ষে আসার আগের কোনো ইতিহাস গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ আমাদের আহলে সুন্নতুল জামাআত মযহাবপন্থী হযরত খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি (রহঃ) সেখ সিরহিন্দি মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ) মাওলানা আব্দুর রহিম (রহঃ), শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) যাঁদের নাম বৃটিশরা ভারতবর্ষে আসার আগে থেকেই পাওয়া যায়। শুধু পাওয়া যায় তা নয় তাঁদের জীবন চরিতই হল ভারতবর্ষের এক একটি জ্বলন্ত ইতিহাস।

আমাদের আহলে সুন্নতুল জামাআতের মযহাবপন্থীদের তরফ থেকে চ্যালেঞ্জ রইল সমগ্র আহলে কোরআন ও আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের প্রতি ভারতবর্ষে বৃটিশরা আগমণের পূর্বে আপনাদের যদি কোনো অস্তিত্ব থেকে থাকে তাহলে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলিল দিয়ে প্রমাণ করে দিন যদি বাপের বেটা হন।

আরও একটি চ্যালেঞ্জ রইল, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলিল দিয়ে প্রমাণ করে দিক যে হাদিস অস্বীকারকারীদিগকে আহলে কোরআন বলা হয়েছে এবং ফিকাহশাস্ত্রকে অস্বীকার করে তকলীদ অমান্যকারীদিগকে আহলে হাদিস বলা হয়েছে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত আহলে কোরআন সম্প্রদায় যদি একত্রিত হয়ে যায় তাহলে হাদিস অমান্যকারীদেরকে আহলে কোরআন বলে প্রমাণ করতে পারবে না। আর সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত আহলে হাদিস সম্প্রদায় যদি একত্রিত হয়ে যায়

তাহলে তারা কিয়ামত পর্যন্ত সহীহ হাদিসের দলিল দিয়ে ফিকাহ শাস্ত্রকে অমান্যকারীকে আহলে হাদিস বলে প্রমাণ করতে পারবে না।

“দিলজলো পালা পড়া তো ফলক কো কাম নেহী
জলা কর রাখ না করদেঁ তো দেওবন্দী নাম নেহী।

আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেবের ইতিহাস বিকৃতি

মওলানা আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তিনি ১৯৯৯ সালে মারা গেছেন, তবে তাঁর লিখিত কতকগুলি পুস্তক আমার কাছে মওজুদ রয়েছে। তার মধ্যে, পীরতন্ত্রের আজবলীলা, উল্টো বুঝিল রাম, সাধু সাবধান, মুজতবা (সাঃ) রচনামৃত, গিরাওয়ালা ব্যাম্বু, মুসলিম জীবনাদর্শ, কাট হুজ্জতির জওয়াব প্রভৃতি। তাঁর লেখা ‘সত্যের আলো’ নামক বইটি তৎকালীন ভারত সরকার বাজেয়াপ্ত করে দেন। তার পর তিনি ১৯৬৬ সালে ভারতবর্ষ ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) পালিয়ে যান।

আবু তাহের বদ্ধমানী সাহেবের লেখনী ও রচনা শৈলী ছিল খুবই সুন্দর যার মাধ্যমে তিনি সহজেই সাধারণ মানুষকে ধোকা দিয়ে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছেন। আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব তাঁর অন্যতম কুখ্যাত পুস্তক ‘কাট হুজ্জতির জওয়াব’ পুস্তকে আহলে সুন্নতুল জামাআত মুকাল্লিদ্দিনদেরকে যেভাবে আক্রমণ করেছেন তাতে সত্যই আমরা মর্মাহত। বর্দ্ধমানী সাহেব জনৈক বাংলাদেশী মওলানা আইউব হোসেন সাহেবের

‘সত্যের অপলাপ’ পুস্তকের জওযাবে, ‘কাট হুজ্জতির জওয়াব’ পুস্তকটি রচনা করেছেন।

মওলানা আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব তাঁর ‘কাট হুজ্জতির জওয়াব’ পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “হ্যাঁ, আমি চার মযহব বা ততোধিক ফিরকার উত্থান ও তার ভয়াবহ পরিণতির কথা বলে থাকি। প্রমাণ আছে বলেই বলে থাকি---বানাওটি কথা বলি না। মযহবী ঝগড়াই যে মুসলিম সমাজের পতনের আসল কারণ একথার ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। আপনি অস্বীকার করলেও ইতিহাস কোনোদিন তা অস্বীকার করবে না। এই মযহবপন্থীদের গোঁড়ামী, ঝগড়া বিবাদ আর হঠকারিতার ফলেই যে তাতারীরা সুযোগ পেয়ে মুসলিম সাম্রাজ্য ধ্বংস করেছিল, নিজামিয়া ইউনিভার্সিটি ভেঙে চুরমার করেছিল, সাড়ে পাঁচশত বছরের সঞ্চিত দুর্লভ গ্রন্থরাজী জালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল, চল্লিশ লক্ষ মুসলমান নরনারীকে কতল করেছিল--একথা ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে।” (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা-২০)

মওলানা আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব এখানে ভাঁওতাবাজী দিয়ে সাধারণ মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন মযহবপন্থীদের গোঁড়ামী, ঝগড়া বিবাদ আর হঠকারীতার ফলেই তাতারীরা সুযোগ পেয়ে মুসলিম সাম্রাজ্য ধ্বংস করেছিল। নিজামিয়া ইউনিভার্সিটি ভেঙে চুরমার করেছিল, সাড়ে পাঁচশত বছরের দুর্লভ গ্রন্থরাজী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল, চল্লিশ লক্ষ মুসলমান নরনারীকে কতল করেছিল। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস তা বলে না। ঐতিহাসিক আবুল ফিদা লিখেছেন, “এবনে আলকমি (শিয়া) তাতারীদিগকে বাগদাদ আক্রমণ করার জন্য (গোপনে) লিখেছিলেন

এবং নিজ ভ্রাতাকে (দূত হিসাবে) জবানী পয়গাম দিয়ে, হালাকু খাঁকে, বাগদাদ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।" (আবুল ফিদা ৩য় খণ্ড ১৯৩পৃষ্ঠা)।

আর এই হালাকু খাঁই মুসলিম সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করেছিল, নিজামিয়া ইউনিভার্সিটি জালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল, চল্লিশ লক্ষ মুসলমান নর-নারীকে কতল করেছিল। একথা যদি আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেবের মগজে না ঢোকে তাহলে ঢোকাবে কে ? তিনি শুধুমাত্র জাল ছেঁদো ইতিহাস রচনা করে মুসলমান সমাজকে বিভ্রান্ত করার জঘন্য প্রয়াস করেছেন মাত্র। আর বর্দ্ধমানী সাহেব যে লিখেছেন, চল্লিশ লক্ষ মুসলমান নর-নারীকে কতল করেছিলেন। সেটা চল্লিশ লক্ষ ছিল না, সেটা ছিল ষোল লক্ষ। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন লিখেছেন, "আনুমানিক ১৬ লক্ষ মুসলমান মারা গিয়েছিল।" (তারিখে খোলাফায়ে আরব, পৃষ্ঠা-৪৮৫) 'তারিখে (কবির) তাজকেরাতুল কেরাম' গ্রন্থেও লেখা আছে, "১৬ লক্ষ মুসলমানকে শহীদ করেছিল।"

বাগদাদের ইতিহাস বহু ঐতিহাসিক লিখেছেন আল্লামা হাফেজ জাহবী 'তারিখে ইসলাম' লিখেছেন, আল্লামা জালালুদ্দিন সূয়ুতী (রহঃ) 'তারিখুল খুলাফা' লিখেছেন, ঐতিহাসি সালাউদ্দিন সাগদী 'ওয়াফা বিল ওয়াফা ইয়াত' লিখেছেন, আমেরিকার সেমেটিক সাহিত্যের অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সটল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ফিলিপ. কে. হিট্টি **(The History of Arabs)** লিখেছেন। কোনো ঐতিহাসিকই একথা লেখেননি, ম যহাবপন্থীদের গোঁড়ামী, ঝগড়া বিবাদ আর হঠকারিতার ফলেই তাতারীরা সুযোগ পেয়ে মুসলিম সাম্রাজ্য ধ্বংস করেছিল, নিজমিয়া ইউনিভার্সিটি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল, সাড়ে পাঁচশত বছরের সঞ্চিত দূর্লভ গ্রন্থরাজী জালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল, চল্লিশ লক্ষ মুসলমান নর-নারীকে কতল করেছিল। এ হল আবু তাহের

বর্দ্ধমানী সাহেবের মন-মস্তিষ্ক প্রসূত মনগড়া ছেঁদো ইতিহাস। যার সঙ্গে সত্যতার কোনো সম্পর্কই নেই।

আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব তাঁর লেখা, 'কাট হুজ্জতির জওয়াব' পুস্তকের ২১-২২ পৃষ্টায় 'রাসায়েলে কুবরা' নামক কেতাবের ৩৫২ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন। "পূর্বদেশ গুলোয় তাতারীদের যে প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার কারণ হলো মযহাব নিয়ে ফিরকা পোরস্থদের অতিমাত্রায় গণ্ডগোল। ইমাম শাফেয়ীর সাথে যারা সম্পর্ক রাখে তারা, যারা ইমাম আবু হানিফার সাথে সম্পর্ক রাখে তাদের উপর ভীষণ ভাবে বিদ্বেষ পরায়ণ---এতদূর পর্যন্ত যে তারা হানাফীদেরকে ইসলাম থেকেই খারিজ করে রেখেছে। আবার হানাফিরাও নিজেদের মযহাবের অন্ধ গোড়ামীর দরুণ শাফেয়ীদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ এমনকি তাদেরকেও হানাফিরা ইসলাম থেকে খারিজ করে রেখেছে। আবার ইমাম আহমদের সহিত যারা সম্পর্ক রাখে তারাও মুসলমানদের অন্যান্য মজহাবের উপর ভীষণ চটা। ঐরূপ পশ্চিম দেশগুলোর ইমাম মালেকের সাথে যারা সম্পর্ক রাখে তারাও নিজেদের মজহাবের অন্ধ গোড়ামীর দরুণ অন্যান্য মজহাবের লোকদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ। আর অন্যান্য মজহাব পন্থীদের বিদ্বেষ মালেকীদের উপরও কম নয়।" (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা--২১-২২)

মাওলানা আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব এখানে মযহাবপন্থীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস বর্ণনা করে সাধারণ মুসলমানকে ধোকা দিয়ে বোকা বানানোর প্রয়াস করেছেন মাত্র। তিনি এখানে একথা বোঝাতে চেয়েছেন মজহাবপন্থীরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ। একে অপরের প্রতি পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত।

এর জওয়াবে বলব, আমরা মযহাবপন্থীরা কোনোদিন একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ নই। বর্দ্ধমানী সাহেব যদি একটু চোখ কান খুলে যদি লক্ষ্য করতেন তাহলে দেখতে পেতেন, হযরত খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি (রহঃ) এর মাযার ভারবর্ষে আজমিরে অ বস্থিত। আর হযরত খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি (রহঃ) ছিলেন ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর মুকাল্লিদ অর্থাৎ শাফেয়ী মজহাবের লোক। আর ভারবর্ষ হল হানাফী প্রধান দেশ। যদি সত্য সত্যই হানাফীরা শাফেয়ীদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ন হত তাহলে হযরত খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি (রহঃ) ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে পারতেন না এবং তাঁর মাযারকে হানাফীরা ভারতবর্ষে ভেঙে চুরমার করে দিত। হযরত খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি (রহঃ) ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে পেরেছেন এবং তাঁর মাযার এখানও আজমিরে বিদ্যমান, সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় হানাফীরা শাফেয়ীদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ন নয়।

হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) ছিলেন শাফেয়ী মযহাবের একজন জগদ বিখ্যাত জবরদস্ত সুফী। তিনি তাঁর লেখনী দ্বারা অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার মুসলমান সমাজকে দান করেছেন। তাঁর লেখা 'মিশকাতুল আনওয়ার', 'দাকায়েকুল আখবার', 'ইসলাহে নাফস' 'কিমিয়ায়ে সাআদাত' 'ইহইয়াও উলুমিদ্দিন' প্রভৃতি গ্রন্থ মুসলিম সমাজের এক অমূল্য সম্পদ। ভারবর্ষের সরজমিনে শাফেয়ী মযহাবের কোনো নাম নিশানাও খুঁজে পাওয়া যায় না অথচ ভারতবর্ষের হানাফী মযহাবের অনুসারীরা ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এর উপরিউক্ত গ্রন্থগুলি এখনও ছেপে প্রকাশ করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় হানাফীরা শাফেয়ীদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ নন। যদি সত্য সত্যই বিদ্বেষ পরায়ন হতেন তাহলে হানাফীরা ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এর গ্রন্থগুলিকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিত।

হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) একজন হাম্বলী মযহাবের জবরদস্ত সুফি ও আলেম ছিলেন। তিনি তাঁর লেখনী দ্বারা অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার মুসলমান সমাজকে দান করেছেন। তাঁর লেখা 'ফাতহুর রববানী' 'ফতহুল গায়ব', 'সিররুল আসরার' 'গুনিয়াতুত ত্বালেবীন' প্রভৃতি গ্রন্থ মুসলিম সমাজের এক অমূল্য সম্পদ। ভারতবর্ষের সরজমিনে হাম্বলী মযহাবের কোনো অস্তিত্ব নেই। অথচ ভারতবর্ষের হানাফী মযহাবের অনুসারীরা হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর উপরিউক্ত গ্রন্থগুলি এখনও ছেপে প্রকাশ করছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় হানাফীরা হাম্বলীদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ নন। যদি সত্য সত্যই বিদ্বেষ পরায়ণ হতেন তাহলে হানাফীরা বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর গ্রন্থগুলিকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিত।

ভারতবর্ষের প্রচুর হানাফী মযহাবের অনুসারীরা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর মাযার মুবারক জিয়ারত করতে বাগদাদ গমন করেন। এবং তাঁর পবিত্র মাযার যিয়ারতের ফয়েজ হাসিল করে থাকেন। যদি সত্যি সত্যই হানাফীরা হাম্বলী মযহাবের অনুসারীদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হত তাহলে হানাফীরা আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর মাযার জিয়ারত করার জন্য এতদূর সফর করে বাগদাদ গমন করতেন না। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় হানাফীরা হাম্বলী মযহাবের অনুসারীদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ন নন।

শাইখুল হিন্দ হযরত মওলানা মাহ্মুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) এবং মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ) ভারতবর্ষের হানাফী মযহাবের জবরদস্ত আলেম ছিলেন। মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) কুর্আন শরিফের উর্দু তরজমা করেন এবং

মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ) কোরআন শরীফের তফসীর রচনা করেন। মাহামুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) এর কোরআন শরীফের তরজমাটিকে ইংরাজী অনুবাদ করে ও মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ) এর 'তাফসিরে মা আরেফুল কোরআন' গ্রন্থটিকে বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র মক্কা মোয়াজ্জমা থেকে সউদি বাদশাহ বাংলা অনুবাদ করে বাদশাহী খরছে ছাপিয়ে হাজিসাহেব দিগকে হজ্জের মৌসুমে বিনামূল্যে বিতরণ করতেন।

এখন আমার আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেবকে প্রশ্ন, সউদি বাদশাহ এবং সউদি ইমামগণ প্রত্যেকেই হলেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর মুকাল্লিদ অর্থাৎ হাম্বলী মযহাবের অনুসারী। হাম্বলীরা যদি সত্যসত্যই হানাফীদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হত এবং হানাফীদেরকে যদি সত্য সত্যই ইসলাম থেকে খারিজ মনে করত, তাহলে তারা উপরিউক্ত দুজন দেওবন্দী হানাফী আলেমের লিখিত তফসীর কেন হজের মৌসুমে বিনামূল্যে বিতরণ করতেন ? এর সঠিক জওয়াব জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব সুস্থ মস্তিষ্কে দিতে পারবেন কি ?

পর্যবেক্ষণ করলে আরও দেখা যায়, হানাফী মযহাবের যতগুলি ফিকাহের গ্রন্থ রয়েছে তাতে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ) এবং ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এই তিনজন ইমামের কোনো সমালোচনা করা হয়নি। এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো কটু বাক্য প্রয়োগ করা হয়নি।

অপরদিকে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর যতগুলি ফিকাহ গ্রন্থ রয়েছে তাতে, ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ) এবং ইমাম

শাফেয়ী (রহঃ) এই তিনজন ইমামের কোনো সমালোচনা করা হয়নি এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো কটুবাক্য প্রয়োগ করা হয়নি।

অপরদিকে ইমাম মালেক (রহঃ) এর যতগুলি ফিকাহ গ্রন্থ রয়েছে তাতে, ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা (রহঃ), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এবং ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এই তিনজন ইমামের কোনো সমালোচনা করা হয়নি এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো কটুবাক্য প্রয়োগ করা হয়নি।

অপরদিকে হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর যতগুলি ফিকাহ গ্রন্থ রয়েছে তাতে ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা (রহঃ) ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল(রহঃ) এবং ইমাম মালেক (রহঃ) এই তিনজন ইমামের কোনো সমালোচনা করা হয়নি এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো কটুবাক্য প্রয়োগ করা হয়নি। কেবল মতামত ও দলীল গুলির সমালোচনা করা হয়েছে।

সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় ইমাম শাফেয়ীর সাথে যারা সম্পর্ক রাখে তারা যারা ইমাম আবু হানিফার সাথে সম্পর্ক রাখে তাদের উপর ভীষণভাবে বিদ্বেষ পরায়ণ নয় এবং হানাফীদেরকে ইসলাম থেকে খারিজ করে রাখেনি। আবার হানাফীরাও নিজেদের মযহাবের অন্ধ গোঁড়ামীর দরুণ শাফেয়ীদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ নয়, তাদেরকে হানাফীরা ইসলাম থেকে খারিজ করে রাখেনি। আবার যারা ইমাম আহমদের সহিত সম্পর্ক রাখে তারাও মুসলমানদের অন্যান্য মজহাবের উপর ভীষণভাবে চটা নয়। ঐরূপ পশ্চিম দেশগুলোর ইমাম মালেকের সাথে যারা সম্পর্ক রাখে তারাও নিজেদের মজহাবের অন্ধ গোড়ামীর দরুণ অন্যান্য মজহাবের লোকেদের প্রতি বিদ্বেষ

পরায়ণ নয়। আর অন্যান্য মজহাবপন্থীদের উপর মালেকীরা বিদ্বেষ পরায়ণ নয়। এ হল আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেবের মনগড়া উপন্যাস-মার্কা ছেঁদো ইতিহাস।

আর আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব ‘রাসায়েলে কুবরা’ নামক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে সাধারণ মানুষকে ধোকা দিয়ে বোকা বানানোর প্রয়াস করেছেন। এখন আমি বর্দ্ধমানী সাহেব ও তাঁর চ্যলাচামুণ্ডাদের বলব, আপনারা ত কোরআনও সহীহ হাদিস ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থকে দলিল বলে মানেন না। তাহলে আপনি যে ‘রাসায়েলে কুবরা’ নামক কেতাবের যেসব উদ্ধৃতি পেশ করেছেন সেগুলি কোরআন শরীফের কত নম্বর পারায় কত নম্বর রুকুতে কত নম্বর আয়াতে তা বর্ণনা রয়েছে দয়া করে শানে নুযুল সহ বিস্তারিত বর্ণনা করবেন। যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর অবতীর্ণ কোরআন শরীফে দেখাতে না পারেন তাহলে আহলে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদদের উপর কি নতুন কোনো আসামানী কেতাব অবতীর্ণ হয়েছে ? যেখানে উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলো আল্লাহ পাক আহলে হাদিসদের উপর অবতীর্ণ করেছেন। (নাউজুবিল্লা সুম্মা নাউজুবিল্লাহ)।

আর যদি বলেন হাদিস শরীফে আছে, তাহলে সনদ সহকারে বিস্তারিত বর্ণনা করবেন। আর কোন কোন মুহাদ্দিস এগুলোকে সহিহ বলেছেন তাদের নামও দয়া করে উল্লেখ করবেন। এবং হাদিস শরীফের নামও উল্লেখ করবেন।

আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব সৈয়দ রশীদ রেযা নামক জনৈক ঐতিহাসিকের লেখা ‘আলমানার’ নামক গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১১নম্বর পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি স্বীয় ‘কাট হুজ্জতির জওয়াব’ পুস্তকের ২২ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “ইবনুস সামআনী শাফেয়ী ম

যহাব গ্রহণ করার দরুণ হানাফীরা ভীষণভাবে রেগে যায়। ফলে হানাফী ও শাফেয়ীদের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। এর ফলে মরো নগর ও খোরাছানের রাজধানী শ্মশানে পরিণত হয়।" (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা--২২)

এখন আমার আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেবকে প্রশ্ন, সৈয়দ রশীদ রেযা একজন শিয়াপন্থী ছিলেন না সুন্নী মুসলমান ছিলেন সেকথা লেখেননি। সৈয়দ রশীদ রেযা একজন শিয়া ঐতিহাসিক ছিলেন। আর আমাদের আহলে সুন্নতুল জামাআতের প্রত্যেক মুসলমানদের উসুল (নীতি) হল শিয়াদের রেওয়াতকৃত কোনো হাদিস যেমন গ্রহণয়োগ্য নয় ঠিক তেমনি শিয়াদের বর্ণনাকৃত ইতিহাসও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, শিয়ারা তাদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য হাদিসের মধ্যে যেমন জাল হাদিস রচনা করে মুসলিম উম্মহকে বিভ্রান্ত করার জঘন্য প্রয়াস করেছে ঠিক তেমনি শিয়ারা জাল ইতিহাস রচনা করেও মুসলমান সমাজকে বোকা বানানোর জঘন্য প্রয়াস করেছে।

সৈয়দ রশীদ রেযা কেন জাল ইতিহাস রচনা করে মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছেন তা পরবর্তী পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হবে ইনশাল্লাহ।

আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব তাঁর উক্ত পুস্তকের ২৩ নম্বর পৃষ্ঠায় সৈয়দ রশীদ রিযা সাহেবের 'মহাবিয়াৎ'; গ্রন্থের ৫৬ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, "তাতারীদের যে ফেতনার কারণে ইসলামের ভিত্তি শুদ্ধ নড়ে উঠেছিল, তার একমাত্র কারণ হলো হানাফী ও শাফেয়ীদের ঝগড়া। তাতারীদের আক্রমণের ফলে ইসলামী শক্তির বুনিয়াদ যেভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, পরবর্তীকালে সে ক্ষতি আর পূরণ হয়নি।" (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা-২৩)

আগেই বলে রাখি আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব সৈয়দ রশীদ রিযার 'মহাবিয়াৎ' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে মানুষকে বোকা বানানোর প্রয়াস করেছেন। আমি আগেই বলেছি সৈয়দ রশীদ রেযা একজন শিয়া ঐতিহাসিক ছিলেন। আর সৈয়দ রশীদ রেযা যে ইতিহাস রচনা করেছেন তা নিতান্তই জাল ও বানোয়াট। প্রকৃত ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর রচিত ইতিহাসের দূর থেকেও কোনো সম্পর্ক নেই। সৈয়দ রশীদ রেযা বলেছেন, তাতারীদের যে ফেতনার কারণে ইসলামের ভিত্তি শুদ্ধ নড়ে উঠেছিল, তার একমাত্র কারণ হলো হানাফী ও শাফেয়ীদের ঝগড়া।

কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস তা বলে না। তাতারীদের যে ফেতনার কারণে ইসলামের ভিত্তি শুদ্ধ নড়ে উঠেছিল এবং পরবর্তীকালে বাগদাদ পতনের মুল কারণ যে হানাফী ও শাফেয়ীদের ঝগড়া ছিল না নিরপেক্ষ ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়।

এর জবাবে মাওলানা ওসমান গনি সাহেব তাঁর 'কাশফুল হিজাব আন ওয়াজহি লা-মজহাব' (লা-মাজহাব রহস্য ফাঁস) নামক গ্রন্থের ৯০ ও ৯১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ''বাগদাদের আববাছি খলিফাদের শেষ বাদশাহ মোছ্তানছের বিল্লাহ এর পুত্র মোস্তাছিম বিল্লাহ পিতার পরই সিংহাসনে বসেন। ইনি বড় আলেম ও মোহাদ্দশ ছিলেন। এবুনুন্নাজার তাঁহাকে হাদিসের সনদ দিয়াছিলেন। দিমিয়াতি ৪০টা হাদিস তাঁহার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। বাপ দাদার মতোই তিনি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস, এবনে আলকমি যখন খলিফার উজির (প্রধানমন্ত্রী) হলেন তখন থেকেই ভাগ্য বিপর্যয় আরম্ভহল। এবনে আলকামী যে, কট্টর রাফেজি (শিয়া) ছিল, সেটা

অতিশয় গোপন ছিল, খলিফা আদৌ জানতেন না। এই এবনে আলকামিই মুসলমানদের ধ্বংস ডেকে আনবে। সে প্রকাশ্যে খলিফার সঙ্গে ছিল, কিন্তু অতি গোপনে তাতারীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। (উদ্দেশ্য আববাসী খলিফাকে ধ্বংস করে হযরত আলীর বংশের শিয়া খলিফা সিংহাসনে বসান) ৬৫৮ হিজরী সনে একটা আগুন মদিনায় দেখা গিয়াছিল। সেই আগুন প্রকাশ পাওয়ার আগে একটা ভূমিকম্প হয়েছিল। এই ঘটনা জজবুল কুলুব ইলা ছিয়ারিল মাহবুব ইত্যাদি গ্রন্থে বিস্তারীত ভাবে লিখিত আছে। এই অগ্নিসম্পর্কে হাদিসেও উল্লেখ আছে। ম দিনার পাহাড়ের পাথর পর্যন্ত গলে যেত। কিন্তু মদিনা শহরে প্রবেশ করে নাই। (এর এক বৎসর পর) ৬৫৫ হিজরী সনে চেঙ্গিস খান এর পৌত্র হালাকু খাঁ দুই লক্ষ তাতারী সৈন্য নিয়ে বাগদাদ আক্রমণ করে। এদিকে এবনে আলকামী (শিয়া) এর পরামর্শ মত পূর্ব হতেই সৈন্যদের সংখ্যা কমানো হয়েছিল। এছাড়াও যতটুকু ছিল বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমে সৈন্য যাহা ছিল তাহাই মোকাবিলা করার জন্য পাঠান হল। এবনে আলকামির ষড়যন্ত্র সফল হল। অর্থাৎ খলিফার সৈন্যদের পরাজয় হল। দুইমাস পর্যন্ত মোস্তাছিম বিল্লাহ বাগদাদের শাহী ম হলের হালাকু খাঁর বেষ্টিত অবস্থায় অবরুদ্ধ থাকলেন। এবনে আলকামীর পূর্ব ষড়যন্ত্র মোতাবেক বাদশাহকে বললেন, আপনি আদেশ করলে আমি সন্ধি করিয়ে দিতে পারি। বাদশার আদেশ পেয়ে সেই কুচক্রী এবনে আলকামি হলাকু খাঁর নিকট গিয়ে ফিরে এসে বলল, হালাকু খাঁ আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী। আপনার সিংহাসন আপনাকে দিয়ে দেবেন, তবে তাহার একটি আকাঙ্খা হল তিনি আপনার ছেলে আবু বকরকে দিয়ে তাঁহার মেয়ের বিবাহ দিতে চান। খলিফা মোস্তাসিম ঐ কুচক্রীর কথা বিশ্বাস করে সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদ থেকে বাইরে হয়ে হালাকু খাঁর শিবিরে আগমন করলেন, সঙ্গে রাজসভার গণ্যমান্য সকলকেই নিয়ে গেলেন, কুচক্রি এবনে আলকামি পূর্ব হতেই

হালাকু খাঁকে বলে রেখেছিল, আমি আপনার শিবিরে খলিফাকে তাহার সভ্যসদ সহ সপরিবারে হাজির করে দিচ্ছি। ওরা হাজির হলেই সকলকেই হত্যা করবেন। আমার আরজ আমাকে প্রধানমন্ত্রী করবেন। আর কোনো (উলুবী বংশীয়) সম্প্রদায়ের লোককে খলিফা করবেন। খলিফা মোস্তাছিম বিল্লাহকে ও তাঁহার সভাসদ, পরিবারবর্গকে হালাকু খাঁ হত্যা করল। আব্বাসী শেষ খলিফার খেলাফৎ বাগদাদ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। খলিফার সঙ্গে বাগদাদের ষোল লক্ষ মুসলমান শহীদ হয়ে গেলেন। বাগদাদের পথ ঘাট শহীদ মুসলমানদের রক্তে প্লাবিত হল। মুসলমানদের কৃষ্টি কালচার সাজ সরঞ্জাম ও আব্বাসী খলিফার ইতিহাস চিরতরে দজলা নদীতে ডুবে গেল।" (কাশফুল হিজাব আন-ওয়াজহি-লা-মজহাব, কৃত-মওলানা ওসমান গণি, পৃষ্ঠা ৯০-৯১)

জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা জাহাবী (রহঃ) ইসলামের ভিত্তি নড়ে যাবার কারণ ও বাগদাদ পতনের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "বাগদাদ পতনের মূল কারণ ও দ্বীন থেকে বাগদাদবাসীদের সরে দাড়ানো এবং স্বেচ্ছাচার ছিল। বাহ্যিক কারণ যেটা ঘটেছিল সেটা হল, এবনে আলকামি (শিয়া সম্প্রদায়) যে খলিফা মোস্তাছিম বিল্লাহ এর প্রধান মন্ত্রী ছিল। বাগদাদের খলিফার প্রতি গোপনে হিংসা পোষণ করতো। তলে তলে আব্বাসী খেলাফত ধ্বংস করে উলুবী (শিয়া) খেলাফৎ প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ় সংকল্প করেছিল।" (দুয়ালুল ইসলাম, ২য় খণ্ড , ১১৯ পৃষ্ঠা)

ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন তাঁর প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, "এবনে আলকামি নিজ নিজ সৈন্যদিগকে বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়ার পর আরবালের শাসনকর্তা

এবনে ছলাবাকে দিয়ে তাতারীদের বাগদাদ আক্রমণের জন্য উৎসাহ দেয়।” (ইবনে খালদুন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা--৫৩৭)

ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন আরো লিখেছেন, “হালাকু খাঁ মোসলেম খলিফা এবং মোসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে খুবই ভীত, শঙ্কিত ছিল। কিন্তু যখন (নাসিরুদ্দিন তুসী শিয়া) তাহাকে বুঝাইল যে, খোদার ইচ্ছায় পৃথিবী বা প্রকৃতি তাহার নিয়ম মতোই চলে। (অর্থাৎ কাহারও মহত্ত বা মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে না) দেখুন খলিফা মোস্তাছিম বিল্লাহ হজরত জাকারিয়া (আঃ) ও তাঁর পুত্র এহইয়া অপেক্ষা সম্মানিত নহেন। অনুরূপভাবে হজরত আলী (রাঃ) এর পুত্র এমাম হোসেন (রাঃ) অপেক্ষা মর্য্যাদাশালী অদৌ নহেন। শত্রুরা উভয়ের মুণ্ডপাত করেছিল, অথচ আজও পৃথিবী তাহার পথে চলছে। প্রকৃতির এটাই নিয়ম, আপনি হিম্মত করে (বাগদাদ) আক্রমণ করুন। অতঃপর জিলহাজ্জ মাসে (হিজরী সন ৬৫৫) হালাকু খান বাগদাদ্ আক্রমণ করল এবং বাগদাদকে সমূলে ধ্বংস করল, ১৬ লক্ষ লোক শহিদ হয়ে গেলেন।” (ইবনে খালদুন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৩৭)

বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফেদা তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিখেছেন, “এবনে আলকামি (মুস্তাছিম বিল্লাহর প্রধানমন্ত্রী) ততারীদের লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, তোমরা বাদদাদ আক্রমণ কর। এমনকি নিজের ভ্রাতাকে একাজের দায়িত্ব দিয়া তাতারীদের কাছে পাঠিয়ে দেয়।”(তারিখে আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা--১৯৩)

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রহঃ) তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ ‘তারিখুল খুলাফা’ গ্রন্থে লিখেছেন, “খলিফা মোস্তাছিম বিল্লাহ তাঁর প্রধানমন্ত্রী মুইনুদ্দিন এবনে

আলকামীর উপরে খুবই আস্থাশীল ছিলেন ও বিশ্বাস রাখতেন। সেই এবনে আলকামীই তাঁর রাজ্য ধ্বংস করেছিল। সে খলিফার সঙ্গে গোপনে সংযোগ রেখেই চলত। সে আববাসী খেলাফৎ ধ্বংস করে তথায় উলুবী (শিয়া) খেলাফৎ কায়েম করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল। তাতারী (হালাকু খাঁর দল) দিগকে ইরাক, বাগদাদ দখলে করার জন্য আমন্ত্রণ দিতেছিল। কিন্তু এ সংবাদ খলিফার কাছে সর্বদা গোপন রাখত।" (তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা--৪৭৬)

সুতরাং সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাতারীদের যে ফেতনার কারণে ইসলামের ভিত্তি শুদ্ধ নড়ে উঠেছিল এবং বাগদাদের পতন ঘটেছিল সেটা হানাফী ও শাফেয়ীদের ঝগড়া ছিল না। সেটা ছিল খলিফা মোস্তাছিম বিল্লাহর শিয়া প্রধানমন্ত্রী আলকেমীর গোপন ষড়যন্ত্র। আর যেহেতু ঐতিহাসিক রশীদ রেযা শিয়াপন্থী ছিলেন সেজন্যই তিনি শিয়া প্রধানমন্ত্রী আলকেমীর গোপন ষড়যন্ত্রকে তাঁর রচিত ইতিহাসে ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করে গেছেন এবং তিনি শিয়া ষড়যন্ত্রকে হানাফী ও শাফেয়ী ঝগড়া বলে উল্লেখ করে জাল ইতিহাস রচনা করে শিয়া প্রধানমন্ত্রী আলকেমীকে সাধু সাজিয়ে দিয়েছেন। অথচ আল্লামা জাহাবী (রহঃ), ইবনে খালদুন, ইতিহাসিক আবুল ফিদা, ঐতিহাসিক আল্লামা জালালুদ্দিন সূয়ুতী (রহঃ) যেসব ইতিহাস রচনা করেছেন তাতে ইসলামের ভিত্তি নড়ে যাওয়ার জন্য এবং বাগদাদ পতনের জন্য হানাফী ও শাফেয়ীদের ঝগড়ার কথা ঘুনাক্ষরেও উল্লেখ করেন নি। কিন্তু ঐতিহাসিক সৈয়দ রশীদ রেযা নিজেদের পূর্বপুরুষের জঘন্য ইতিহাসকে ইচ্ছাকৃতভাবে চালাকী করে ধামাচাপা দিয়ে সেটাকে হানাফী ও শাফেয়ী ঝগড়া বলে উল্লেখ করে ইতিহাসের পাতাকে কলঙ্কিত করেছেন।

আর আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব কুখ্যাত ঐতিহাসিক সৈয়দ রশীদ রেযার চক্রান্তকে ধরতে না পেরে তাঁর চক্রান্ত মার্কা ফুটো ইতিহাসের গোলক ধাঁধার প্যাঁচালো জটিল ফাঁদে ফেঁসে গিয়ে নিজেও বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং মুসলমান সমাজকেও বিভ্রান্ত করার জঘন্য প্রয়াস করছেন।

এখন আমার আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেবকে প্রশ্ন, আহলে সুন্নতুল জামাআতের এতগুলো লিখিত ইতিহাস গ্রন্থগুলি কি তিনি একবারও পড়ে দেখেন নি ? না না জানার ভান করেছেন ? এতগুলো ইতিহাস গ্রন্থ মওজুদ থাকার পরও তিনি কি কেবলমাত্র শিয়া ঐতিহাসিক রশিদ রেযার লিখিত ইতিহাসগ্রন্থই পেলেন তাঁর পুস্তকে উদ্ধৃত করার জন্য ? এর জবাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী কি দেবেন ? তাহলে এই ছোট শিয়ারা (আহ্লে হাদিস) বড় শিয়াদের ইতিহাস কেমন গুপ্ত ভাবে সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে ঢোকাবার চেষ্টা করছে পাঠকগণ ভেবে দেখুন।

আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব তাঁর উক্ত পুস্তকের ২৪ ও ২৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন; “আইউব হোসেন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, চার মযহাব যখন ঠিক, চারভাবে ভাগ হয়ে যখন ঠিক কাজ করেছেন তখন শাফেয়ীদেরকে ধ্বংস করার জন্য হালাকু খানকে কেন ডেকে এনেছিলেন ? অস্বীকার করবেন পারবেন না। ঐ দেখুন তুস শহরের হানাফীরা শায়েফীদেরকে ধ্বংস করার জন্য হালাকু খাঁকে ডেকে নিয়ে এসে নগরের সিংহ দ্বার খুলে দিয়েছিল। কিন্তু তাতারীদের তরবারী যখন নিস্কাসিত হলো তখন তারা শায়েফীদের সঙ্গে হানাফীদেরকেও ছাড়েনি। হানাফী শায়েফী নির্বিশেষে সকলকেই তারা শেষ করে ফেললো।” (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা-২৪-২৫)।

আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব এখানে জালও বানোয়াট ইতিহাস রচনা করে পাঠক সমাজকে বিভ্রান্ত করার জঘন্য প্রয়াস করেছেন মাত্র। ইতিহাসের কোনো গ্রন্থ থেকে এটা প্রমাণিত নয় যে শাফেয়ীদেরকে ধ্বংস করার জন্য হালাকু খানকে হানাফীরা ডেকে এনেছিলেন এবং তুস শহরের হানাফীদের শাফেয়ীদেরকে ধ্বংস করার জন্য ধ্বংস করার জন্য হালাকু খাঁকে ডেকে নিয়ে এসে নগরের সিংহদ্বার খুয়ে দিয়েছিল।

আমি আগেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ থেকে প্রমাণ করে দিয়েছি হালাকু খাঁ যতবার মুসলমানদের উপর আক্রমণ করেছে প্রত্যেকবার শিয়ারা তাকে সহযোগিতা করেছে। হানাফীরা কোনোদিন শাফেয়ীদেরকে ধ্বংস করার জন্য হালাকু খাঁকে ডেকে আনেন নি। আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব যদি কোনো প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ থেকে পাতা পৃষ্ঠার সনদ দিয়ে যদি প্রমাণ করে দিতে পারতেন যে হানাফীরা শাফেয়ীদেরকে ধ্বংস করার জন্য হালাকু খানকে ডেকে এনেছিলেন তাহলে পরখ করে দেখতাম। কিন্তু তিনি তা না করে দলিলবিহীন সনদবিহীন জাল ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে যেভাবে কুদোকুদি করেছেন তাতে সত্যিই আমরা মর্মাহত।

ইমাম আবু হানিফার আগের মাজহাব

আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব তাঁর উক্ত পুস্তকের ২৫ ও ২৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “আদমের আগে যেমন বনী আদমের অস্তিত্ব ছিল না ঠিক তেমনি ইমাম আবু হানিফার আগেও হানাফীর অস্তিত্ব ছিল না।” (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা ২৫-২৬)

এখানে বলব, বর্দ্ধমানী সাহেব হানাফী মজহাবের আসল স্বরূপটাই বুঝতে পারেননি। আদম (আঃ) এর আগে বনী আদমের অস্তিত্ব ছিল না ঠিকই কিন্তু আল্লাহ পাক যখন হযরত আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করেন তারপর বনী আদমের উৎপত্তি হয়। তারপর তাঁকে এমন শরীয়াত দান করেন যা আদম (আঃ) এর সৃষ্টি হওয়ার আগে ছিল না। হযরত আদম (আঃ) এর সৃষ্টির পরে তাঁকে শরীয়াত দান করা হয়। কিন্তু হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা (রহঃ) এর উপর কোন শরীয়াত ও নাযিল হয়নি এবং কোনো নতুন মজহাবও ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) সৃষ্টি করে যাননি। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) যেসব মশলা মশায়েল ফিকাহ গ্রন্থ আকারে মুসলিম উম্মাহকে দিয়ে গেছেন তা ইমাম আবু হানিফার জন্মের বহু আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। শুধুমাত্র ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কোরআন হাদিস ও তার থেকে মশলা মশায়েল ইস্তেম্বাত করে উম্মতের কাছে পোঁছে দিয়েছেন। সুতরাং হানাফী ফেকাহ কোরআন হাদিস ও নতুন সমস্যার সমাধান ছাড়া অন্য কিছু নয়। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শরীয়াতী মশলা মশায়েলগুলোকে একত্রিত করে ফেকাহ শাস্ত্রকে দাঁড় করিয়েছেন। আর ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) যেহেতু কোরআন হাদিস থেকে গবেষণা করে মশলা মাশায়েল ইস্তেম্বাত করে ফেকাহ শাস্ত্রকে দাঁড় করিয়েছেন সেজন্য তাঁর ফেকাহশাস্ত্রকে হানাফী ফেকাহ বলা হয়। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) প্রথমে কোরআন থেকে এরপর হাদিস শরীফ থেকে মশলা অনুসন্ধান করেছন আর যখন তিনি হাদিস শরীফে মাশআলা খুঁজে পাননি তখন তিনি নিজে ইজতেহাদ করে কিয়াসের মাধ্যমে কুর্‌আন-হাদিসের আলোকে মাসআলা-মাসায়েল ইস্তেম্বাত করেছেন। আর ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর ইস্তেম্বাত কৃত মশলা মাশায়েলগুলিই ফিকাহ হানাফী নামে পরিচিত।

সুতরাং এখানে আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেবকে বলব, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর আগে হানাফী মজহবের অস্তিত্ব ছিল না ঠিকই কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কোরআন ও হাদিস থেকে যেসব মাশআলা মশায়েল গ্রহণ করেছেন সেগুলোর অস্তিত্ব তো ছিল। আর ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর ইস্তেম্বাতকৃত মাশআলা মশায়েল আমরা গ্রহণ করে যদি নিজেদের জীবন অতিবাহিত করি তাহলে বর্দ্ধমানী সাহেবের কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) তাঁর কেতাবে লিখেছেন, "আমরা আমাদের ইমামকে কেবল এই জন্য অনুসরণ করি যে তিনি কোরআন হাদীস সম্পর্কে আমাদের থেকে অধিক জ্ঞান রাখেন।" (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ)

সুতরাং এখানে পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল ইমাম আবু হানিফার জন্মের বহু আগে থেকেই আমরা যেসব মাশআলা মাশায়েল অনুসরণ করি তা বিদ্যমান ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেসব মাশআলা মাশায়েল শেষ জীবন পর্যন্ত আমল করে গেছেন এবং তাঁর উম্মতকে তিনি আমল করতে বলে গেছেন সেইসব মাশআলা মাশায়েলগুলি ও পরবর্তী ইজতেহাদী মাশআলাগুলি একত্রিত করে রেখে গেছেন সেগুলিই হল হানাফী মযহাব। তাই আমরা মুহাম্মদ (সাঃ) কে অনুসরণ করি তবে ইমাম আবু হানিফার মাধ্যমে। একথায় আমরা আল্লাহর কোরআন মানি তবে ইমাম আবু হানিফার মাধ্যমে, আমরা হুজুর (সাঃ) এর হাদিস মানি তবে ইমাম আবু হানিফার মাধ্যমে, আমরা হুজুর (সাঃ) এর শরীয়াত মানি তবে ইমাম আবু হানিফার অনুসরণে, আমরা নামাজ পড়ি হুজুর(সাঃ) এর তারিকা অনুযায়ী তবে ইমাম আবু হানিফার অনুসরণে। আমরা নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত, সমস্ত ইসলামী শরীয়াতী মাশআলা মাশায়েল মানি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর তবে ইমাম আবু হানিফা

(রহঃ) এর পথ প্রদর্শনে। এখনও যদি জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব মনে করেন, ইমাম আবু হানিফার আগে হানাফীদের অস্তিত্ব ছিল না বলে হানাফী মজহাব মানা যাবে না, তাহলে আমরাও বলতে পারি, ইমাম বুখারী (রহঃ) এর আগে বুখারী শরীফের অস্তিত্ব ছিল না, ইমাম মুসলিম (রহঃ) এর আগে মুসলিম শরীফের অস্তিত্ব ছিল না, ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এর আগে তিরমিযী শরীফের অস্তিত্ব ছিল না, ইমাম আবু দাউদ(রহঃ) আগে আবু দাউদ শরীফের অস্তিত্ব ছিল না, ইমাম নাসাই (রহঃ) এর আগে নাসাই শরীফের অস্তিত্ব ছিল না। ইমাম ইবনে মাজাহ (রহঃ) এর আগে ইবনে মাজাহ শরীফের অস্তিত্ব ছিল না, এক কথায় সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থের সংকলক ছয় মুহাদ্দিসের আগে সিহাহ সিত্তার অস্তিত্ব ছিল না, তাবলে কি সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থ মানা যাবে না ?

এর উত্তরে হয়তো জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব ও তাঁর মন্ত্রশিষ্যরা বলবেন, সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থের সংকলক ছয়জন মুহাদ্দিসের আগে সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থ ছিল না ঠিকই কিন্তু মুহাদ্দিসিনে কেরামরা তাঁদের হাদিসগ্রন্থে যেসব হাদিসগুলি সংকলন করেছেন সেই হাদিসগুলি তো ছিল। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে হাদিসগুলি সংকলিত ছিল না। পরবর্তীকালে মুহাদিসরা সেগুলি সংকলন করে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

এখানে আমরা জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব ও তাঁর মন্ত্রশিষ্যদের বলব, ছয়জন মুহাদ্দিসদের আগে হাদিস গ্রন্থগুলি ছিল না কিন্তু হাদিসগুলি ছিল। অনুরূপভাবে ইমাম আবু হানিফার আগে হানাফীদের অস্তিত্ব ছিল না কিন্তু হানাফী

ফিকাহার অস্তিত্ব ছিল তবে সেগুলো সংকলিত ও লিপিবদ্ধ ছিল না। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) সেগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন।

আর এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, আল্লাহ পাক ছয় মুহাদ্দিসের হাদিস সংকলনের আগে চার ইমামকে ফিকাহ্ সংকলনের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। কেননা, সাধারণ মানুষের আমলের জন্য হাদিসের কোন প্রয়োজন নেই। তাদের জন্য কুর্‌আন-হাদিসের নির্যাস ফিকাহের প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের কাছে হাদিস বেকার। সেজন্য আল্লাহ পাক আগে ইমামদেরকে দিয়ে ফেকাহ্ সংকলন করিয়েছেন, পরে মুহাদ্দিসদেরকে দিয়ে হাদিস সংকলন করিয়েছেন।

হর ইবতেদা সে পেহ্লে হর ইন্তেহা কে বাদ
জাতে নবী বুলন্দ হ্যায় জাতে খুদা কে বাদ।
দুনিয়া মে জিস কদর এহতেরাম কে কাবিল হ্যায় লোগ,
ম্যায় সবহি কো মানতা হুঁ, মগর মুস্তাফা কে বাদ।।

কা’বা শরীফে চার মুসাল্লা নির্মান ও ওহাবীদের তাণ্ডবলীলা

আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব তাঁর উক্ত পুস্তকের ২৯ পৃষ্ঠায় ‘বদরুত তালে’ কেতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, “এই চার মজহাবের লোকেরা যখন ৮০১ হিজরীতে হজ করতে গিয়ে ইমামত নিয়ে ঝগড়া লাগিয়ে দিলেন, তখন বাদশাহ ফরজ বিনে

বর্কুক সরকেশী পবিত্র কাবা ঘরের চার পাশে চার মজহাবের জন্য চার মুসাল্লা ঠিক করে দিলেন।” (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা-২৯)

এর জবাবে একথায় বলব বাদশাহ ফরজ বিনে বর্কুক সরকেশী পবিত্র কাবা ঘরের চার পাশে চার মজহাবের জন্য চার মুসাল্লা ঠিক করে দিয়ে সঠিক কাজই করেছিলেন। তার কারণ, তিনি যদি একাজ না করতেন তাহলে কাবা ঘরে ইমাম নিয়ে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে যে ঝগড়া বেঁধে গিয়েছিল তা কোনোদিনই মিটত না। পরবর্তীকালে হয়তো সেটা সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার দরুণ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় পর্যবসিত হয়ে যেত। তাই তৎকালীন মুহুর্তকে সামাল দেওয়ার জন্য বাদশাহ ফরজ বিনে বর্কুক সরকেশী কাবা ঘরের চার পাশে চার মুসাল্লা ঠিক করে দিয়ে কোনো অন্যায় কাজ করেননি।

আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব তাঁর পুস্তকের ৩০ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে আহলে হাদিসদের দুর্বার আন্দোলন ও কঠোর হস্তেক্ষেপের ফলে চার মুসাল্লা উঠে গেছে।” (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা-৩০)

প্রিয় পাঠক লক্ষ করুন, আহলে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদ মৌলবী আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব নিজে স্বীকার করেছেন আহলে হাদিসদের দুর্বার আন্দোলন ও কঠোর হস্তক্ষেপের ফলে চার মুসাল্লা উঠে গেছে। আর আরব জাতির ইতিহাস পাঠকারী প্রত্যেক মানুষই জানেন পবিত্র কাবা ঘর থেকে চার মুসাল্লা উঠিয়ে দেওয়ার সময় কি তাণ্ডবলীলাই না হয়েছিল।

হযরত রসুলে কারীম (সাঃ) এর একটা ভবিষ্যৎবাণী সহীহ বোখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ ভবিষ্যৎ বাণীটি হুজুর (সাঃ) এর প্রকাশ্য মোজেজা ছিল। যা ১২০০ শত বছর পর প্রকাশ পেয়েছিল। হাদিসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, হে আল্লাহ ! আমাদের শামে, আমাদের ইয়ামানে বরকত দান করুন। উপস্থিত লোকেদের কেউ কেউ বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ(সাঃ)। আমাদের 'নজদের' জন্যও দোয়া করুন। বললেন, হে আল্লাহ ! আমাদের শামে, আমাদের ইয়ামানে বরকত দান করুন। পুনরায় উপস্থিত লোকেরা বললন, ইয়া রাসুলআল্লাহ! আমাদের 'নজদের' জন্য ও দোয়া করুন। আমার মনে হয় তৃতীয়বার তিনি বলেছেন, সেখানে তো ভূমিকম্প, ফেতনা এবং শয়তানের শিং উদিত হবে। (বোখারী শরীফ, পৃষ্ঠা--১০৪৭ অনুবাদ-- শায়খুল হাদিস মওলানা মোহাম্মদ আজীজুল হক সাহেব, হাদিস নং--৬৬১৩)।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন 'লা-মাজহাব রহস্য ফাঁস' পুস্তক।

এই পবিত্র বাণী হুজুর (সাঃ) এর মৃত্যুর ১২০০ বছর পর অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়। আরবে নজদ এলাকায় মহম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী নামক এক ব্যক্তির জন্ম হয়। তিনি ইসলাম ধর্মের সরলতা ও স্বাধীনতার নাম করে, কোরআন ও সুন্নত জীবিত করার নাম করে মুসলিম উম্মাহকে ধোকা দিয়ে এক নতুন মজহাবের প্রতিষ্ঠা করেন যে মজহাবের নাম সাধারণের নিকট মজহাবের প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুযায়ী 'ওহাবী' মজহাব বলা হত। এরা কোরআন সুন্নত জীবিত করার নাম নিয়ে আলেম, ওলামা ও সাধারণ মুসলমান যাঁরা তাঁদের মজহাব মানেন না, তাদেরকে কাফের মোশরেক বলত। ১২১২ হিজরী সনে রোম সম্রাট দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, রাজ্য লিপ্সায় মত্ত হয়ে, কুখ্যাত এই ওহাবী দল মক্কা মদিনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

সুন্নতের ধ্বজাধারী দলটা, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে পবিত্র হারামাইন শরিফাইন অর্থাৎ মক্কা মদিনা এবং হেরেমের বাসিন্দাদের উপর অকথ্য আক্রমণ বরং তাণ্ডব চালায় ওলি আউলিয়া এমনকি সাহাবায়ে কেরামগণের কবরগুলি পর্যন্ত ধ্বংস করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। মজহব মান্যকারী মুসলমান ও ওলামাগণকে হত্যা করে। তাঁদের মাল আসবাবপত্র লুঠতরাজ করে নেয়। ওহাবী মতাবলম্বী ছাড়া সকল মুসলমানকে মোশরেক ও কাফের বলতে থাকে। তাদের মাল লুণ্ঠন করা হালাল বলে ফতোয়া দেয়।

আল্লমা শামী (রহঃ) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'দোর্রুল মোখতারে'র হাসিয়া 'রদ্দুল মোহতার' নামে প্রসিদ্ধ ফতোয়ায়ে শামীতে লিখেছেন, "যেমন আমাদেরই কালে একটা ঘটনা ঘটেছে, আব্দুল ওহাব নজদীর অনুগামীরা নজদ থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করে পবিত্র মক্কা মদিনার হারম শরিফে আক্রমণ চালায়। তারা মুখে নিজেদেরকে হাম্বলী বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু তাদের বিশ্বাস তারাই শুধু (সারা বিশ্বের মাঝে) মুসলমান, আর যারা তাদের অনুগামী নয় সকলেই মোশরেক (বিধর্মী) এই বিশ্বাস বশতঃ আহলে সুন্নতুল জামাতের লোকজন ও ওলামাদেরকে হত্যা করা হালাল মনে করত। অতঃপর এমন দিন আসল, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই ঐদ্ধত্য ক্ষমতা চূর্ণ বিচুর্ণ করে দিলেন। তাদের জনপদ ধ্বংস করে দিলেন, মুসলমান সৈন্যগণ তাদের ধ্বংস করে ১২৩৩ হিজরী সনে পুনরায় জয়লাভ করলেন।" (রদ্দুল মোহতার (শামী) ৩য় খণ্ড, ৩৩৭ পৃষ্ঠা)

আর এই ওহাবীদের দুর্বার আন্দোলন ও কঠোর হস্তক্ষেপের ফলে কাবা ঘরের চার পাশে যে চার মজহাবের চার মুসাল্লা ছিল তা উঠে গেছে। আর আবু তাহের বর্দ্ধমানী

সাহেব লিখেছেন, আহলে হাদিসদের দুর্বার আন্দোলন ও কঠোর হস্তক্ষেপের ফলে চার মুসাল্লা উঠে গেছে। সুতরাং তাঁর লেখনী দ্বারা প্রতীয়মান হয় আহলে হাদিস ও ওহাবী মজহাব উভয় দলই হল এক। যারা আহলে সুন্নতুল জামাআতের মজহাবপন্থী, তকলিদপন্থী আলেম ওলামা ও সাধারণ মানুষকে হত্যা করাকে হালাল বলে মনে করত। এবং তাঁদের দলের মূল গুরুই হলেন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী। যার দল সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর পবিত্র হাদিসে শয়তানের দল বলে বর্ণনা করেছেন।

‘ফাথহুল মোবিন মা-তানবিহীল ওহাবীন’ গ্রন্থে লেখা আছে, “মোট কথা আজকালের মজহাব অমান্যকারী (আহলে হাদিস) দল ঐ ওহাবী দলভুক্ত এবং অধিকাংশ আকিদা ও মসলা মাশায়েল ঐ ওহাবীদেরই অনুগামী। মোহাম্মদ এবনে আব্দুল ওহাব এর লিখিত ‘কিতাবুত তৌহিদে’র উপর এরা সকলেই আমলে করে থাকে। ইংরেজ সরকার যখন এদের প্রতি বিদ্রোহের আকাঙ্খায় কড়া নজর দিতে আর করে এদের পিছনে গোয়েন্দা পুলিস বাহিনীর কড়া নজর পড়তে থাকে, তখন থেকে এরা নিজের ওহাবী নাম পাল্টে ফেলে। নিজেদেরকে কখন মোহম্মদী, কখন আহলে হাদিস, কখন আহলে তৌহিদ, কখন গায়ের মুকাল্লিদ ইত্যাদি ইত্যাদি বলতে থাকে, আমরা হাদিস কোরানের উপর আমল করি। ইমাম মোজতাহেদগণকে মান্য করা শেরক, বেদায়ত।” (ফাথহুল মোবিন মা-তানবিহীল ওহাবীন,--পৃষ্ঠা-৪৩৩)

সুতরাং একথা প্রমাণ হয়ে গেল ভারতবর্ষের আহলে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদ ও আরবের ওহাবী তারা উভয় দলই হল এক। যারা তৎকালীন আরব ভূখণ্ডে আহলে

সুন্নতুল জামাআতের আলম ওলামা ও সাধারণ মুসলমানকে হত্যা করে করে সেখানে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়।

বর্ধমানী সাহেবের অভিযোগ সাহাবায়ে কেরাম ও ইমামগন আহ্‌লে হাদিস ছিলেন

আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব তাঁর 'কাট হুজ্জতির জওয়াব' পুস্তকে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, ইমামে আজম আবু হানিফা (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ), ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) প্রত্যেকে আহলে হাদিস ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।

জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব সাহাবায়ে কেরামগণকে আহলে হাদিস প্রমাণ করতে গিয়ে, ইমাম হাকেমের 'মুসতদরক' ও খতিব বাগদাদির 'শর্ফ আসহাবুল হাদিস' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, "বিখ্যাত সাহাবী হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) কোন মুসলমান যুবককে দেখতে পেলে বলতেন, মারহাবা, হযরত রসুলে করীম (দঃ) এর অসিয়ত অনুযায়ী তোমাকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করে দেওয়ার (অর্থাৎ স্থান দেওয়ার) ও তোমাদেরকে হাদিস বুঝিয়ে দেওয়ার হুকুম করে গেছেন। তোমরা আমাদের স্থলাভিষিক্ত ও আমাদের পরবর্তী আহলে হাদিস।" (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা-৩৩)

বর্দ্ধমানী সাহেব আরও লিখেছেন, "ইনি (অর্থাৎ আবু সাঈদ খুদরী) রসুলুল্লাহর (দঃ) সাহাবাগণকে আহলে হাদিস নামে অভিহিত করেছেন আর

সাহাবাদের শিষ্যমণ্ডলী তাবেয়ীদেরকেও আহলে হাদিস বলে আখ্যাত করেছেন।" (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা-৩৪)

জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব ইমামে আযম আবু হানিফা (রহঃ) কে আহলে হাদিস প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি ইসতাস আবু মনসুর আব্দুল কাহের বাদদাদী তাঁর 'উসুলে দ্বীন' নামক কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, "মতবাদের দিক দিয়ে ইমাম আবু হানিফার নীতি আহলে হাদিসদের মত ছিল।" (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা-৩৬)

জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব ইমাম মালেক (রহঃ) কে আহলে হাদিস প্রমাণ করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর 'ফতোয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া'র উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন,

"ইমাম মালেক বলতেন---আমি একজন মানুষ মাত্র, কোন বিষয়ে আমার অভিমত যেমন সঠিক হতে পারে, তেমনি বেঠিকও হতে পারে। তোমরা আমার উক্তি কুরআন ও সুন্নাহর দ্বারা বাছাই করে দেখো।"

তিনি 'ঈকাযুল হিমম' এর ১০২ পৃষ্ঠা ও 'কওলুল মুফীদ' নামক কিতাবের ১৭ ও ২৪ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, "ইমাম মালেক একথাও বলেছেন--আমি একজন মানুষ মাত্র। আমার অভিমত ভূলও হয় ঠিকও হয়। অতএব তোমরা সব সময় আমার অভিমত পরীক্ষা করে দেখো। আমার যে অভিমত গ্রহণ করবে আর যা প্রতিকুল পাবে তা তোমরা অগ্রাহ্য করবে।" (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা-৩৯)

জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব তাঁর উক্ত পুস্তকে তওয়ালী ওাছিছ কেতাবের ৬৪ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) কেও আহলে হাদিস প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ইমাম শাফেয়ীও আহলে হাদিস ছিলেন। মহামতি ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, তোমরা আহলে হাদিসগণের দলভুক্ত থেকো, কারণ তাঁরা অন্যান্য দল অপেক্ষা অধিকতর সঠিক পথের পথিক। ইমাম সাহেব আরও বলেছেন, কোন আহলে হাদিসের সুদর্শন লাভ রাসুলুল্লাহের (দঃ) সহচরবৃন্দের সুদর্শন লাভের তুল্য। আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। তারাই আমাদের জন্য ধর্মের মূল বস্তু রক্ষা করেছেন এবং এজন্যই তাঁরা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।" (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা--৪১)

জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব 'মারেফাতে উলুমুল হাদিস' এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) কে আহলে হাদিস বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব লিখেছেন, "ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আহলে হাদিস ছিলেন (৮ম পৃষ্ঠা) একবার ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল ফিরকায়ে নাজিয়া অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত দল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন, এরা যদি আহলে হাদিস না হয় তাহলে আমি জানিনা আর কারা হবে।"

তিনি 'কিতাবুশ শর্ফ' কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, "একবার আবদাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে ইমাম আহম্মদ বলেন---যদি আহলে হাদিসরা আবদাল না হয় তাহলে আমি অবগত নহি আল্লাহর আবদাল কারা।"

তিনি 'কিতাবুশ শর্ফ' কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে আরও লিখেছেন, "একবার ইমাম আহম্মদের সামনে কোন ব্যক্তি আহলে হাদিসগণকে মন্দ বলল তিনি ঐ ব্যক্তিকে তিনবার যিনদিক অর্থাৎ বেদীন বলেছিলেন।" (কিতাবুশ শর্ফ, ৫২ পৃষ্ঠা)।

মোট কথা মহামতি ইমাম চারজন যে আহলে হাদিস ছিলেন এবং আহলে হাদিসের প্রশংসা করেছেন---একথা তাঁদের উক্তি থেকেই প্রমাণিত হলো।" (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা---৪৩)

পরিশেষে জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব খতীব বাগদাদীর 'তারিখে বাগদাদী'র উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম আবু হানিফার শিষ্য কাজী আবু ইউসুফ (রহঃ) কে আহলে হাদিস প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁর পুস্তকে লিখেছেন, "কাযী আবু ইউসুফ আহলে হাদিসদেরকে ভালবাসতেন এবং তাঁদের পক্ষপাতী ছিলেন।" (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা--৪৪)

সুতরাং এককথায় বলতে গেলে জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম(রাঃ), ইমাম আবু হানিফা (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) প্রত্যেককে তিনি আহলে হাদিস বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

এখন আমার আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেবকে প্রশ্ন, 'আহলে হাদিস' কথার বাংলা আক্ষরিক অর্থ কি ? জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব উপরিউক্ত মহান সাহাবা ও ইমামগণকে আহলে হাদিস প্রমাণ করতে গিয়ে যেসব উদ্ধৃতি পেশ করেছেন তার মূল আরবি

হুবহু এবারত পাঠ করলে দেখা যায় উপরিউক্ত মহান সাহাবাগণের জন্য এবং ইমামগণের জন্য কোথাও 'আসহাবুল হাদিস' ও 'আহ্লুল হাদিস' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর প্রত্যেক আরবী এবারতের বাংলা তরজমা জনাব বর্ধমানী সাহেব 'আহলে হাদিস' করেছেন। তাহলে 'আহলুল হাদিস' ও 'আসহাবুল হাদিস' এই দুই আরবী শব্দের অর্থই কি আহলে হাদিস ? অর্থ যাইহোক 'আহলুল হাদিস' ও 'আসহাবুল হাদিস' শব্দের বাংলা আক্ষরিক অনুবাদ কি তা জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব পেশ করেন নি। 'আসহাবুল হাদিস' ও 'আহ্লুল হাদিস' এই আরবী শব্দের বাংলা আক্ষরিক অনুবাদ কি তা জনাব বর্দ্ধমানী তথা সমগ্র আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের কাছে জানতে চাই। দয়া করে কোনো নির্ভরযোগ্য আরবী-বাংলা লুগাতের (অভিধান) পৃষ্ঠা নম্বর সহ উল্লেখ করবেন।

'আহ্লুল হাদিস' বা 'আসহাবুল হাদিস' শব্দের বাংলা আক্ষরিক কি সেটা এখানে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। আলোচনার বিষয়বস্তু হল, উপরিউক্ত মহান সাহাবায়ে কেরামগণ ও মহান ইমামগণ কি সেই ভাবধারার আহলে হাদিস ছিলেন যে ভাবধারা নিয়ে বর্তমানের লা-মজহাবী, গায়ের মুকাল্লিনি সম্প্রদায় নিজেদেরকে আহলে হাদিস বলে সমাজে ঢাক পিটিয়ে বেড়ায়। কখনোই না। আমরা জানি হাদিস শরীফে এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থে যতবার 'আহ্লুল হাদিস' ও 'আসহাবুল হাদিস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে প্রত্যেক বারই মুহার্সিনে কেরামদেরকে উশ্যে করেই বলা হয়েছে। উক্ত শব্দ দুইটি মুহাদ্দিসিনে কেরাম ছাড়া সাধারণ আলেম উলামা বা সাধারণ কোনো মুসলমানকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়নি। তাই ইমামে আযম আবু হানিফা (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ, এবং ইমাম আবু ইউসুফ(রহঃ) প্রত্যেকেই মুসলিম সমাজের এক একটি করে

জবরদস্ত মুহাদ্দিস ছিলেন। অর্থাৎ তাঁদেরকে আহলে হাদিস বা মুহাদ্দিস বলতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

আহলে হাদিস শব্দের প্রকৃত অর্থ হল, হাদিস, ফেকাহ, উসুলে হাদিস, উসুলে ফেকাহ, হাদিসের ভাষ্য গ্রন্থ, ইতিহাস, আসমায়ে রিজাল, বা সনদে হাদিস গ্রন্থ, ঐ জাতীয় বহু গ্রন্থাবলীতে শত শত বৎসর যাবৎ 'আহলুল হাদিস' ও 'আসহাবুল হাদিস' শব্দ দুটি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে যার দ্বারা হাদিস এবং সনদে হাদিসের উপর খেদমতকারীদের অর্থাৎ মুহার্সিনে কেরামগণকেই বোঝানো হয়েছে। সেই হাদিসের খেদমতকারীগণ হানাফী হউক, শাফেয়ী হউক, মালেকী হউক আর হাম্বলীই হউক। তাদেরকেও নির্বিশেষে আহলে হাদিস বলা হয়। আর যেহেতু ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ), ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) প্রত্যেকে আসমায়ে রিজাল বা সনদে হাসিদের উপর প্রচুর পরিশ্রম করেছেন সেজন্য তাঁরা প্রত্যেককে আহলে হাদিস ছিলেন।

আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব ও তাঁর দলবলের লোকেরা অর্থাৎ গায়ের মুকল্লিদ সম্প্রদায় যেভাবে নিজেরকে আহলে হাদিস বলে আস্ফালন করে বেড়াচ্ছেন সেটা তাদের অস্তিত্বের মতোই মিথ্যা। এখানে আমি বলব, আবু তাহের বর্দ্ধমানী তথা তাঁর দলবলের প্রত্যেক মানুষই কি মুহাদ্দিস? তাঁরা প্রত্যেকেই কি হাদিস, ফেকাহ, উসুলে হাদিস, উসুলে ফেকাহ, আসমায়ে রিজাল, বা সনদে হাদিসের বিদগ্ধ পণ্ডিত ? এমনও দেখা যায় গায়ের মুকাল্লিদদের সাধারণ মানুষেরা অনেকে ইস্তেঞ্জার মশলাও ঠিক মত জানে না, তাহলে তারা আহলে হাদিস হয় কি করে ? গায়ের মুকাল্লিদদের সাধারণ মানুষের কথা না হয় বাদ দিলাম জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেবও হাদিস,

ফিকাহ, উসুলে হাদিস, উসুলে ফিকাহ, আসমায়ে রিজালের উপর কোনো কাজ করে যান নি। দ্বান্দিক মনোভাব নিয়ে গুটিকতক পুস্তক রচনা করেই ক্ষান্ত হয়ে গেছেন। সুতরাং যুক্তির বিচারে আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব নিজেও আহলে হাদিস নন।

আহলে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদরা বলে থাকেন, হাদিসের শাস্ত্র বিষারদ ও হাদিসের উপর আমলকারী প্রত্যেকেই হলেন আহলে হাদিস। এখানে আমাদের প্রশ্ন, হাদিসের শাস্ত্র বিষারদ ও হাদিসের উপর আমলকারী কি একই অর্থ বোধক শব্দ ? এক কথায় শিক্ষক ও ছাত্র, পথ প্রদর্শক ও পথিক, বক্তা ও শ্রোতা, ডাক্তার ও রোগি কি একই ব্যক্তিকে বলা হয় ? উত্তরে প্রত্যেকে বলবেন, না। কারণ, শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষাদান করা, আর ছাত্রের কাজ হল শিক্ষা গ্রহণ করা। পথ প্রদর্শকের কাজ হল পথ নির্দেশ করা, আর পথিকের কাজ হল পথ চলা। বক্তার কাজ হল বক্তব্য দেওয়া, আর শ্রোতার কাজ হল বক্তব্য শোনা। ডাক্তারের কাজ হল রোগীকে চিকিৎসা করে ঔষধ প্রদান করা, আর রোগীর কাজ হল ঔষধ সেবন করা। আর শিক্ষক ও ছাত্র, পথ প্রদর্শক ও পথিক, বক্তা ও শ্রোতা, ডাক্তার ও রোগী যেমন একই শ্রেণীর ব্যক্তি হতে পারে না ঠিক তেমনি আহলে হাদিস (মুহাদ্দিস) ও হাদিসের উপর আমলকারী কোনোদিনই একব্যক্তি হতে পারে না।

তাই পরিশেষে বলা যায়, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এই পরিপ্রেক্ষিতে আহলে হাদিস ছিলেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে ? আর উপরিউক্ত মহান ইমামগণকে আহলে হাদিস বলে জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব কি প্রমাণ করতে চেয়েছেন ?

আমরা জানি আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব ও তাঁর চ্যালাচামুণ্ডারা অর্থাৎ গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের লোকেরা ফেকাহ শাস্ত্রের বিরোধিতা করাকে এবং ফেকাহ শাস্ত্রকে পৃথিবী থেকে মূলোৎপাটন করাকে জীবনের ব্রত বানিয়ে নিয়েছেন। আর আমার তরফ থেকে সমগ্র আহলে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়কে চ্যালেঞ্জ রইল যদি সহীহ হাদিস থেকে একথা প্রমাণ করে দিতে পারে না যে 'আহলুল হাদিস' ও 'আসহাবুল হাদিস' এই শব্দ দুইটি যে ফেকাহ শাস্ত্রকে অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে তাহলে আমি সারা জীবন তাঁদের গোলামী করব।

যদি হিম্মৎ হয় তবে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সূর্য তার রোদ্র দেওয়া বন্ধ করে দিতে পারে, চাঁদ তার কিরণ দেওয়া বন্ধ করে দিতে পারে, পৃথিবীর ঘুর্ণন গতি স্তবধ হয়ে যেতে পারে। এ সব কিছুই সম্ভব হতে পারে কিন্তু আহলে হাদিস দলের লোকেরা আমার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে এটা আমি বিশ্বাস করি না।

আর জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব যে প্রথমেই ইমাম হাকেমের 'মুসতদরক' ও খতিব বাগদাদীর 'শর্ফ আসহাবুল হাদিস' থেকে যে সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদিস পেশ করেছেন তা নিতান্তই মওযু ও মনগড়া বানোয়াট। উক্ত হাদিসটি তিরমিযী ২য় খণ্ড ও মুসতদরক হাকেমের ১ম খণ্ডের ২৭৩ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত আছে, কিন্তু সেখানে 'আহ্লে হাদিস' শব্দের কোন অস্তিত্ব নেই। জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব ইমাম হাকেমের মুসতদরক গ্রন্থের নাম নিয়ে নিতান্তই ধোকা দেবার প্রয়াস করেছেন। বায়হাকী শরীফের 'শুয়াবুল ইমানে' ঐ 'আহ্লে হাদিস' শব্দটি পাওয়া যায়। কিন্তু এই হাদিসটির রাবী আবু হারুণ আল আবদী পরিত্যক্ত, মিথ্যাবাদী, শিয়া (তকরীব)।

শো'বা (রহঃ) বলেছেন, "উক্ত রাবীর হাদিস গ্রহণ করার চেয়ে নিজের গর্দান কেটে নেওয়া ভালো"। অন্যান্য রিজাল বিদরা বলেছেন, দুর্বল, তার হাদিস বিশ্বাস যোগ্য নয়, পরিত্যাক্ত বহুরূপী শিয়া বা খারিজী। মিথ্যাবাদী, মনগড়া হাদিস বর্ণনা কারী, তার কাছে একটা কিতাব ছিল যাতে লেখা ছিল হজরত ওসমান গণী (রাঃ) কে যখন কবরে প্রবেশ করানো হয়, তিনি কাফের ও জাহান্নামী ছিলেন। উক্ত রাবী হারুণ আল আবদী ফেরাউনের থেকেও বেশী মিথ্যাবাদী। (মিজানুল এ'তেদাল, ৩য় খণ্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা/ তথ্যসূত্র ঃ 'আলমাজাহির' পত্রিকার ২য় বর্ষ হিঃ ১৪১৩, খ্রীঃ ২০১২ সংখ্যা থেকে মুফতি মহম্মদ ইবরাহীম কাসেমী লিখিত 'এরা আহ্‌লে হাদিস না লা-মাযহাবী' নামক প্রবন্ধের ১৯ পৃষ্ঠা থেকে ও তাঁর প্রণীত 'তারাবীহ্‌ প্রসঙ্গ' নামক পুস্তকের ৭ নং পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত)

এই মওযু হাদিসের উপর ভিত্তি করে জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব ও তার দলবলের লোকেরা নিজেদের নামকরণ করেছেন 'আহ্‌লে হাদিস'। এই হল তাঁদের দূর্বল ও জাল হাদিস মানার নিকৃষ্ট নমুনা। অতএব তাঁদের সহীহ্‌ হাদিস অনুসারে চলার দাবী চরম ধাপ্পাবাজী ও মিথ্যার প্রচার মাত্র। কিন্তু তারা স্বার্থের অনুকূলে বা সুযোগ পেলেই আবু হারুণ আল আবদীর মতো পরিত্যাক্ত, মিথ্যাবাদী, বহুরূপী শিয়া বা খারিজী, হজরত উসমান গণী (রাঃ) কে জাহান্নামী ও কাফের বলনে ওয়ালা লেখকের কিতাব সংগ্রকারী মওযু হাদিস পেশ করতেও লজ্জাবোধ করেন না। এইরূপ বর্ণনাকারীর হাদিস মাননে ওয়ালারাই বর্তমানে 'আহ্‌লে হাদিস' নামে পরিচিত। সম্রাট আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষের দিকে লক্ষ্য করে সত্য কথাই বলেছিলেন, "সত্য সেলুকস বিচিত্র এই দেশ !"

বর্ধমানী সাহেবের বিচিত্র অভিযোগ
হানাফীরা কোন্ আবু হানিফার অনুসারী ?

জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব তাঁর **'কাট হুজ্জতির জওয়াব'** পুস্তকে লিখেছেন, ''আচ্ছা বলুনতো আপনাদের হানাফী মজহাবটা আবার কি ? ইমাম আযম আবু হানিফা যে সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন তার নাম হানাফী মজহাব ? না ইমাম আবু ইউসুফ যে সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন তার নাম হানাফী মজহাব ? না ইমাম মোহম্মদ যা বলে গেছেন তার নাম হানাফী মজহাব ? না ইমাম যফুর যা সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন তার নাম হানাফী মজহাব ? না ইমাম কখীর ফতোয়া, না ইমাম আবু বকর জাজসাস আহম্মদ বিন আলী রাযীর সিদ্ধান্তের নাম হানাফী মজহাব ? না কুদুরীর লেখক আহমদ বিন মোহম্মদ বিন আহম্মদ বাগদাদীর, না হিদায়ার লেখক বুরহানুদ্দিন বিন আবী বকর মুর্গীনান এর, না কানযুদ্দাকায়েকের লেখক আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ বিন আহমদের, না শরহে বিকায়ার লেখক আব্দুল্লাহ্ বিন মসউদ মেহবুবীর, না দুররে মুখতারের লেখক মোহম্মদ আলাউদ্দিন বিন শেখ হুসায়নীর, না মা-লা-বুমিনহোর লেখক কাযী সানাউল্লাহ পানিপত্রীর অভিমত সমূহের নাম হানাফী ম জহাব ? না ইমাম আবু হানিফা নোমান বিন সাবেতের পরে যে উনিশজন ইমাম আবু হানিফা এসেছিলেন---যেমন, ১) আবু হানিফা বারিরাহ, ২) আবু হানিফাতুল আসগর, ৩) আবু হানিফা সানি উররেফা, ৪) আবু হানিফা খাতাবী, ৫) আবু হানিফা জাফর বিন আহম্মদ, ৬) আবু হানিফা সাগীর, ৭) আবু হানিফা আদুব্বী, ৮) আবু হানিফা জায়লেয়ী, ৯) আবু হানিফা বিন মহানাল ওয়াসেতী, ১০) আবু হানিফা আহমাদুল মুসাদ্দেকুবনো মুহাম্মদ, ১১) আবু হানিফা বিন বায়ানিস সাবিফিল হাজ, ১২) আবু হানিফা বিন সেমাক, ১৩) আবু হানিফা আন সুলায়মান, ১৪) আবু হানিফা শাহেদা,

১৫) আবু হানিফা খাওয়ারজামী, ১৬) আবু হানিফা নুবান বিন আবি আবদিল্লাহ, ১৭) আবু হানিফা ওয়াসতী, ১৮) আবু হানিফা কুফী ওয়ালেদ আবদিল আকরাম, ১৯) আবু হানিফা দাতুননূরী--ইনাদের সিদ্ধান্তের নাম হানাফী মযহাব ? না ইমাম আবু হানিফা নোমান বিন সাবেতের সঙ্গে যত জনের নাম লিখলাম তাদের সকলের সিদ্ধান্তকে একত্রিত করে জগখিচরি তৈরী করে তার নাম রেখেছেন হানাফী মযহাব ? একথা ভাল করে বুঝাবেন।” (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা-৪৫-৪৬)

ধন্য আমরা জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেবের জ্ঞানের বহর দেখে। তাঁর জ্ঞানের দৌড় যে কতদূর তা তাঁর উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে আমরা পরিস্কার বুঝতে পারি। হানাফীদের প্রতি উপরিউক্ত প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে যে মুর্খতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে তিনি জ্ঞানী মহলে হাসির পাত্র হিসাবে পরিচিত হয়েছেন এবং জনসাধারণের কাছ থেকে গাল খাওয়ার কাজ করেছেন তা তিনি বুঝতে পারেন নি। আসল কথা হল, জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব হানাফী মজহাবের আসল স্বরূপটাই বুঝতে পারেন নি। যদি বুঝতে পারতেন তাহলে এরকম মুর্খ লোকের মত প্রশ্ন করতেন না।

প্রথমেই বলে রাখি, আমরা হানাফী মজহাবের লোকেরা ইমামে আজম হযরত আবু হানিফা (রহঃ) এর মসলক মেনে চলি। আর ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কোরআন, হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামদের ইজমাকে মন্থন করে সেখান থেকে মশলা মাশায়েল ইস্তেম্বাত করে যে ফেকাহ শাস্ত্রকে দাঁড় করেছেন তার নাম হানাফী মজহাব। এক কথায় হানাফী ফিকাহ বা হানাফী মজহাব কোরআন, হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামদের ইজমা ও ইজতিহাদী মসলা। আর যেসব মশলা মাশায়েল ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কোরআন, হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামদের ইজমা থেকে পাননি সেখানে তিনি

কিয়াসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীকালে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম যফুর, ইমাম কখীর, ইমাম আবু বকর জাজসাস আহম্মদ বিন আলী রাযী ইমাম আবু হানিফার সিদ্ধান্ত, ফতোয়া ও ফিকাহ শাস্ত্রকে গ্রন্থ আকারে লিপিবদ্ধ করে বিভিন্ন নাম দিয়েছেন। যেমন, আহম্মদ বিন মোহাম্মদ বিন আহম্মদ বাগদাদী (রহঃ) ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর ফিকাহ শাস্ত্রকে একত্রিত করে নাম দিয়েছেন কুদুরী, বুরহানুদ্দীন বিন আবী বকর মুর্গীনান (রহঃ) ইমাম আবু হানিফার ফিকাহ শাস্ত্র কে একত্রিত করে নাম দিয়েছেন হিদায়া, আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ বিন আহম্মদ (রহঃ) ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)এর ফিকাহ শাস্ত্রকে লিপিবদ্ধ করে নাম দিয়েছেন 'কানযুদ্দাকায়েক', আব্দুল্লাহ বিন মসউদ মহেবুরী(রহঃ) ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)এর ফিকাহ শাস্ত্রকে লিপিবদ্ধ করে নাম দিয়েছেন 'শারহে বিকায়া', মোহাম্মদ আলাউদ্দিন বিন শেখ হুসাইন (রহঃ) ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর ফিকাহশাস্ত্রকে একত্রিত করে লিপিবদ্ধ করে নাম দিয়েছেন 'মা-লা-বুদ্দামিনহো' প্রভৃতি। এখন যদি কেউ বলে ইমাম আবু হানিফার সিদ্ধান্ত হানাফী মজহাব না উপরিউক্ত মনীষিদের লিখিত কেতাবে যা লেখা আছে সেগুলি হানাফী মজহাব ? তাহলে তাকে নিরেট মুর্খ ছাড়া আর কি বলা যাবে ?

এরপর আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব সে উনিশজন আবু হানিফার নাম উল্লেখ করে বলেছেন---"ইনাদের সিদ্ধান্তের নাম হানাফী মজহাব ? না ইমাম আবু হানিফা নোমান বিন সাবেতের সিদ্ধান্তের নাম হানাফী মজহাব।" উত্তরে বলি, এরকম ধরণের প্রশ্ন পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে যাঁরা সামান্যতমও জ্ঞান রাখেন তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবেতের মজহাবের নাম হানাফী মজহাব। আর জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব যে উনিশজন আবু হানিফার নাম

উল্লেখ করেছেন তাঁদের সিদ্ধান্তের নাম কোনোদিনই হানাফী মজহাব নয়। কেননা, ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবেত ছাড়া কোনো আবু হানিফাই কোরআন হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামগণের ইজমাকে মন্থন করে মশলা মাশায়েল ইস্তেম্বাত করে ফেকাহ শাস্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করে যাননি। সুতরাং আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত ছাড়া কোনো আবু হানিফার মজহাব হানাফী মজহাব নয়। আর জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব যে উনিশজন আবু হানিফার নাম উল্লেখ করেছেন তারা কোন দেশে, কোথায় কত হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন ও কত হিজরীতে এন্তেকাল করেছেন তা উল্লেখ করেননি। কেবলমাত্র নাম নিয়েই ক্ষান্ত হয়ে গেছেন।

জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব ও তাঁর মন্ত্রশিষ্যরা শুনে রাখুন, আমরা যে আবু হানিফার মজহাব মেনে চলি তিনি ৮০ হিজরীতে কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাহাবী হজরত আনাস বিন মালেক (রাঃ)সহ ১৭জন সাহাবীকে সচক্ষে দেখেছেন। জগদবিখ্যাত মুহাদ্দিস হজরত ইয়াহয়া বিন ছাইদ আল কিত্তান, হজরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, হজরত ওকী, বিনেল জারাহ, ফিকাহ শাস্ত্র বিশারদ হযরত কাজী আবু ইউসুফ, হজরত ইমাম মুহাম্মদ, যাঁর ছাত্র ছিলেন সেই ইমাম আবু হানিফার মজহাব আমরা মানি। আর কোনো আবু হানিফার মজহাব আমরা মেনে চলি না। জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব ও তাঁর মন্ত্রশিষ্যদেরকে আরও বলি, আবু হানিফা নামধারী যেকোনো ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে তার কথাকে আমরা তিন ঠ্যাঙে লাফিয়ে আপ্তবাক্য বলে মনে করে নেব সেটা হতে পারে না।

জনাব বর্দ্ধমানী সাহেবকে বলি, হজরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আমাদের নবী। তাঁর উপর কোরআন ও শরীয়াত নাযিল হয়েছে। এবং হজরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পর

অসংখ্য মুহাম্মদ নামধারী ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে কার উপর নাযিলকৃত ধর্মের নাম ইসলাম ধর্ম ? নবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর অবতারিত ধর্মের নাম ইসলাম ধর্ম ? না নবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পর যে অসংখ্য মুহাম্মদ নামধারী ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের সিদ্ধান্তের নাম ইসলাম ধর্ম? এরকম ধরণের প্রশ্ন একজন মস্তিস্ক বিকৃত পাগল ছাড়া আর কে করতে পারে ? কেননা পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষই জানেন যে আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর অবতারিত ধর্মের নাম ইসলাম ধর্ম। যিনি আরবের ভূখন্ডে আব্দুল্লাহর ঘরে মা আমিনার গর্ভে ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, যার অসংখ্য সাহাবী বিদ্যমান ছিলেন। যাঁর উপর হজরত জিব্রাইল (আঃ) ওহী নিয়ে আসতেন, যাঁর উপর ২৩ বছর ধরে কোরআন নাযিল হয়েছিল এবং যাঁর উপর পরিপূর্ণ দ্বীন ইসলাম নাযিল হয়েছিল।

ঠিক সেই রকম আমরা সেই ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবেতের মজহাব মেনে চলি যিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর শরীয়াতকে মন্থন করে ফিকাহ শাস্ত্রকে দাঁড় করিয়েছিলেন। এবং তাঁর মজহাবের নামই হল হানাফী মজহাব। এর পরও যদি জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব ও তাঁর মন্ত্রশিষ্য অর্থাৎ লা-মজহাবী-গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের যদি বুঝবার মত মগজ না থাকে তাহলে বোঝাবে কে ?

জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব যখন হানাফী মজহাবীদের প্রতি বাহাসের প্রশ্ন ছুঁড়েই ফেলেছেন তখন জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব ও তাঁর মন্ত্রশিষ্যদের আমি প্রশ্ন করি, আপনাদের আহলে হাদিস মজহাবটা আবার কি ? আরবের মহম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী যিনি আহলে সুন্নতুল জামাআতের প্রত্যেক আলেম ওলামা ও সাধারণ মানুষকে

কতল করাকে জায়েজ মনে করতেন, কোরআন সুন্নত জীবিত করার নাম করে প্রত্যেক মজহাব পন্থীদেরকে (হানাফী, হাম্বলী, শাফেয়ী, মালেকী) কাফের ও মুশরিক বলতেন এবং উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে পবিত্র হারামাইন শরিফাইন অর্থাৎ মক্কা মদিনা এবং হেরেমের বাসিন্দাদের উপর অকথ্য আক্রমণ এবং তাণ্ডবলীলা চালান, ওলী আউলিয়া, এমনকি সাহাবায়ে কেরামগনের কবরগুলি পর্যন্ত ধবংশ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন, মজহাব মান্যকারীদের মাল আসবাবপত্র লুটতরাজ করে নেন, ওহাবী (আহলে হাদিস) মতাবলম্বী ছাড়া, সকল মুসলমানকে মুশরিক কাফের বলতে থাকেন, তাঁদের মাল লুট করাকে হালাল বলে ফতোয়া দেন তাঁর সিদ্ধান্তের নাম আহলে হাদিস মজহাব ? না, আব্দুল হক বেনারসী, যাঁকে সৈয়দ আহমদ বেরলবী (রহঃ) জেহাদী দলের বিরোধীতা করার জন্য দল থেকে বিতাড়িত করেন, তিনি মক্কা শরিফে গিয়ে আশ্রয় নেন। কিন্তু তাঁর জেহাদ বিরোধী আকিদা জানতে পেরে তৎকালীন মক্কা মদিনার উলামাগন তাঁকে হত্যা করার ফতোয়া দেন। সেখান থেকে কোনোক্রমে পালিয়ে এসে তিনি বেনারসে আশ্রয় নেন। তাঁর অধিকাংশ মতবাদ রাফিজি মিশ্রিত ছিল। তিনি নিজেকে আমিরুল মোমেনীন বলে ঘোষণা করেন। (তানবিহুদ্দাল্লীন, পৃষ্ঠা-২) তিনি বলতেন, ***“সাহাবারা পাঁচ পাঁচটা হাদিস জানতেন, আর আমরা সব সাহাবাদের হাদিস মুখস্থ করেছি। সাহাবাদের থেকে আমাদের বিদ্যা বেশী। সাহাবাদের বিদ্যা অতি নগন্য।”*** না তাঁর মতবাদের নাম আহলে হাদিস মজহাব ?

মওলানা নাযির হোসেন দেহলবী যিনি সারা জীবন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চামচাগিরিতে লিপ্ত ছিলেন, যিনি আহত বৃটিশ মহিলা মিসজার লিসেন্স নাম্নী একজন মহিলাকে সেবা সুশ্রষা করে সারিয়ে তুলেন এবং বৃটিশদের প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দেন এবং সরকারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট অর্জন করেন এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ

সরকারের কাছ থেকে ‘শামসুল উলামা’ খেতাবে ভূষিত হন। তিনি আহলে হাদিসদের সমগ্র মশলা মাশায়েলকে একত্রিত করে লিপিবদ্ধ করে নাম দেন ‘ফতোয়া নাযিরিয়া’। এখন আমাদের প্রশ্ন, মিঁয়া নাযির হোসেন দেহলবী সাহেবের সিদ্ধান্তের নাম আহলে হাদিস মজহাব ? না মাওলানা মুহাম্মাদ হোসেন বাটালবী সাহেব যিনি মনে মনে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেবকে ওজু করানো এবং তাঁর জুতো সোজা করে দেওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করতেন। এবং যিনি ‘আহলে হাদিস’ নামকরনটি বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নেন তাঁর রেজিস্ট্রেশনকৃত আহলে হাদিস মজহাবের নাম আহলে হাদিস মজহাব?

মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী যিনি হুলুলিয়া, এত্তেহাদিয়া, জাহামিয়া, মোতাজিলা প্রভৃতি মজহাবসমুহকে একত্রিত করে কোরআন শরীফের তাফসীর ‘বে কালমির রহমান’ লিখেছিলেন। ঐ তাফসিরটি ছিল তাঁর একান্ত মনগড়া, বানোয়াট, সালফে সালেহীন, তাবেয়ীন, সাহাবায়ে কিরামদের তাফসীরের সম্পূর্ণ বিপরীত। যে তাফসীর লেখার পর আহলে হাদিস ওলামারাই তাঁকে মোতাজিলা, জাহামিয়া, জিন্দিক, মোরতাদ, কাফের, গোমরাহ, পথ-ভ্রান্ত ইত্যাদি ফতোয়া দিয়েছেন। এখন আমার প্রশ্ন, মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরীর সমস্ত বাতিল ফিরকাগুলির সমষ্টিগত সিদ্ধান্তের নাম আহলে হাদিস মজহাব ? না গায়ের মুকাল্লিদ মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান হায়দারাবাদী যিনি মনে মনে রাফিজি (শিয়া) আকিদা পোষন করতেন। যিনি শিয়াদের মত লিখেছেন, “মোতা (সাময়িক শর্তে টাকার বিনিময়ে বিবাহ করা বা টাকার বিনিময়ে যে কোনো নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করা) কোরআন শরীফের অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।” (নজলুল আবরার, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩,৩৪) তাঁর এই জঘন্য সিদ্ধান্তের নাম আহলে হাদিস মজহাব ?

মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ী সাহেব যিনি গায়ের মুকাল্লিদদের বিখ্যাত আলেম ছিলেন তিনি লিখেছেন, "অনেক সাফ সাফ মোটা মোটা এমন মাশায়েল আছে যেখানে হজরত ফারুকে আজম (রাঃ) ভুল করেছেন। আমরা এবং আপনারা সবাই একমত যে সেইসব মাশায়েলগুলি উমার (রাঃ) জানতেন না।" (তারিখে মুহাম্মাদী, পৃঃ- ৪১) তাঁর এই সিদ্ধান্তের নাম আহলে হাদিস মজহাব ? না হাকিম ফায়েজ আলম সিদ্দিকি তাঁর 'খেলাফতে রাশিদা' কেতাবে হজরত ইমাম হোসেন (রাঃ) কে পাগল ও বরসাম রোগের রোগী বলে অভিহিত করেছেন তাঁর সিদ্ধান্তের নাম আহলে হাদিস মজহাব ?

পুস্তকের উদ্ধৃতি আর বাড়াবো না। সমস্ত কথা লিখতে গেলে পুস্তকের কলেবর বিরাট আকার ধারণ করবে, তাই আপাততঃ ক্ষান্ত হলাম। পরিশেষে জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী ও তার মন্ত্রশিষ্য অর্থাৎ আহলে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়কে একটি কথাই জিজ্ঞেস করব, উপরিউক্ত যেসব গায়ের মুকাল্লিদ আলেম ওলামাদের আমি যে নাম নিলাম তাদের কার সিদ্ধান্তের নাম আহলে হাদিস মজহাব ? যদি হিম্মৎ হয় এবং সাধারন ও ধর্মীয় জ্ঞান যদি আপনাদের মধ্যে সামান্যটুকুও থেকে থাকে তাহলে আমার প্রশ্নের সদুত্তর দিন। এখন হয়তো গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের লোকেরা বলবেন, আমরা উপরিউক্ত ব্যক্তিগণকে মানি না। কেননা তাঁরা কেউ নবীও ছিলেন না আর সাহাবীও ছিলেন না। তাঁরা প্রত্যেকেই উম্মত ছিলেন। আর উম্মতের মধ্যে ভূল-ভ্রান্তি থাকতেই পারে। আমরা সরাসরি হুজুরের কথা মানি উম্মত-টুম্মত মানি না।

এক কথায় আহলে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদীন সম্প্রদায় যখন কোনো প্রশ্নের জালে ফেঁসে যান তখন এরকম ধরনের পাগলের প্রলাপ বকতে থাকেন। এবং যখন তাঁদের আকারিরীন (পূর্ব পুরুষ) আলেম উলামাদের ভূল-ভ্রান্তি ও কুফরি আকিদা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয় তখন তাঁরা বলেন, আমরা তাঁদেরকে মানি না, তাঁরা ভূল পথে ছিলেন। তাহলে আমরা ত এককথায় বলব, আপনারা যেমন এখন বলছেন, আপনাদের পূর্বপুরুষ আলেমরা ভূল পথে ছিল এবং আপনারা যখন মারা যাবেন তখন আপনাদের পরবর্তী অনুসারীরাও বলবেন যে আপনারা ভূল পথে ছিলেন। সুতরাং আমরা আপনাদের পরবর্তী অনুসারীদের কথা এখন থেকেই বলে দিচ্ছি, আপনারা ভূল পথে আছেন, ভূল পথে ছিলেন এবং ভূল পথেই থাকবেন। কিয়ামত পর্যন্ত আপনারা আপনাদের মসলকের সত্যতা প্রমাণ করতে পারবেন না, আর হুজুর (সাঃ) এর কথা সরাসরি মানা সম্ভব কিনা তা পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

বর্ধমানী সাহেবের অভিযোগ হিদায়া গ্রন্থে সনদ নেই কেন ?

জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব তাঁর 'কাট হুজ্জতির জওয়াব' পুস্তকের ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ''ইমাম আযম আবু হানিফার এন্তেকালের ৪২৩ বছর পর হিদায়া লেখা হয়েছে। এত বছর পর এই হিদায়ার লেখক ইমাম আবু হানিফার উক্তি বলে যেসব কথা হিদায়ায় লিপিবদ্ধ করেছেন তার কোনো সনদ তিনি উল্লেখ করেন নি। আল্লাহর নবীর হাদিস সংকলয়িতাগন যেমন প্রতিটি হাদিসের সনদ, এভাবে উল্লেখ করেছেন-- আমি এই কথা অমুকের মুখে শুনেছি, তিনি অমুকের মুখে শুনেছেন।

ঠিক এইভাবে কিন্তু হিদায়ার লেখক ইমাম আযমের উক্তির সনদ উল্লেখ করেন নি। তিনি কেবল লিখেছেন-- ‘কালা আবু হানিফাতা’ অর্থাৎ আবু হানিফা বলেছেন-- ‘হাযা এনদা আবি হানিফাতা-----অর্থাৎ ইহা আবু হানিফার নিকটে, ‘আন আবি হানিফাতা----অর্থাৎ আবু হানিফা হতে, হাযা কওলে আবি হানিফাতা-----অর্থাৎ এই কথা আবু হানিফার।” (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা-৫৩)

উত্তরে একথায় বলব, আল্লাহর নবী (সাঃ) এর যুগে কোনো হাদিসের গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হয়নি। লিপিবদ্ধ করা হয়েছে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর এন্তেকালের কয়েকশত বছর পর। যদিও সাহাবীরা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদিস ছোট ছোট সহিফা আকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর অধিকাংশই এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং কিছু কিছু সহিফা সাহাবীরা নিজেরাই বিলুপ্ত করে দেন। সুতরাং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর এবং সাহাবীদের যুগে কোনো হাদিসের গ্রন্থ ব্যাপক আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। যার ফলে পরবর্তী কালে শিয়াপন্থীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধী করার জন্য নিজেদের মনগড়া কথাকে হাদিস বলে চালিয়ে দিয়ে মুসলিম সমাজে এক মারাত্মক ফিৎনার সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীকালে মুহাদ্দিসীনে কেরামরা রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদিসগুলি সংকলন করে গ্রন্থ আকারে লিপিবদ্ধ করেন। যেমন, ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী (রহঃ) হাদিসের সংকলন করে লিপিবদ্ধ করে নাম দেন বোখারী শরীফ। আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আলকেশায়রী (রহঃ) হাদিস সংকলন করে লিপিবদ্ধ করে নাম দেন মুসলিম শরীফ। আব্দুর রহমান ইবনে শোয়ায়ব আন নাসায়ী (রহঃ) হাদিস সংকলন করে লিপিবদ্ধ করে নাম দেন নাসায়ী শরীফ। আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী (রহঃ) হাদিস সংকলন করে নাম দেন তিরমিযী শরীফ। আবু দাউদ সোলাইমান ইবনে আশআস সিজেসতানী

(রহঃ) হাদিস সংকলন করে নাম দেন আবু দাউদ শরীফ। আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাজা কাযবেনী (রহঃ) হাদিস সংকলন করে নাম দেন ইবনে মাজাহ শরীফ এবং মুহাদ্দিসিনে কেরামরা হাদিস সহীহ হওয়ার জন্য কতকগুলো শর্ত নির্দ্দিষ্ট করে দেন। আর যেহেতু উপরিউক্ত মুহাদ্দিসিনরা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে এবং তাঁর সাহাবীদেরকে সচক্ষে দেখেন নি এবং তাঁদের যুগে লিখিত সমগ্র হাদিসকে গ্রন্থকারে পাননি সেজন্য তারা রাসুলুল্লহ (সাঃ) এর হাদিসকে সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন। এবং বলেছেন, আমি এই কথা অমুকের মুখে শুনেছি, তিনি অমুকের মুখে তিনি অমুকের মুখে, তিনি আল্লাহর নবীর কাছ থেকে শুনেছেন।

অপরদিকে কোরআন শরীফ সাহাবীদের যুগ থেকেই গ্রন্থ আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেজন্য কোরআনের সত্যতার জন্য কোনো সনদের প্রয়োজন নেই। ঠিক সেই রকম ইমামে আযম আবু হানিফা (রহঃ) ছাত্ররা ইমাম সাহেবের কাছ থেকে মশআলা মাশায়েল শ্রবণ করে গ্রন্থ আকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, যেমন ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ দুজনে মিলে জামেয়ে সগীর, জামেয়ে কবীর, জিয়াদত, কিতাবুল হজ্জ প্রভৃতি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। যেখানে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর ফতোয়া ও মশআলা মাশায়েল সংকলন করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আর হিদায়ার লেখক বুরহানুদ্দীন বিন আবী বকর মুর্গীনান (রহঃ) এর কাছে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ প্রভৃতিদের জাময়ে সগীর, জাময়ে কবীর, জিয়াদত, কিতাবুল হজ্জ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি সংরক্ষিত ছিল। এবং এইসব গ্রন্থ থেকে হিদায়ার লেখক সরাসরি ইমাম আবু হানিফার নাম উল্লেখ করে বলেছেন, 'কালা আবু হানিফাতা' অর্থাৎ আবু হানিফা বলেছেন-----'হাযা এনদা আবি

হানিফাতা'-----অর্থাৎ ইহা আবু হানিফার নিকটে, 'আন আবি হানিফাতা'----অর্থাৎ আবু হানিফা হতে, 'হাযা কওলো আবি হানিফাতা'----অর্থাৎ এই কথা আবু হানিফার।

উদাহরণ স্বরূপ আরও বলা যায়, সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) আমাদের তথা কওম ও মিল্লাতের গৌরব ছিলেন এবং তিনি আমাদের হানাফী মজহাব তথা দেওবন্দীদের পূর্বসূরী ছিলেন। আর আল্লামা শাহ ঈসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত মুরীদানদের মধ্যে একজন ছিলেন। সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) যে কথাগুলো বলে গেছেন সেগুলো হযরত আল্লামা শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) গ্রন্থ আকারে লিপিবদ্ধ করে নাম দিয়েছেন 'সিরাতে মুস্তাকীম'। এখন যদি কেউ সিরাতে মুস্তাকিম গ্রন্থের নাম না নিয়ে সরাসরি কেউ বলে, 'সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী বলেছেন,' 'ইহা সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভীর থেকে 'সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী' হতে, কিংবা 'এই কথা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর' নিকট থেকে কেউ যদি সনদ তালাশ করতে চায় তাহলে তার মতো গোঁয়ার গোবিন্দ আর কেউ হবে বলে মনে হয় না। কেননা 'সিরাতে মুস্তাকিম' গ্রন্থটি পড়লেই বোঝা যাবে 'সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (রহঃ) এর কিনা। ঠিক সেই রকম জাময়ে সগীর, জাময়ে কবীর, জিয়াদত কিতাবুল হজ্জ গ্রন্থগুলি পাঠ করলেই বোঝা যাবে হিদায়াতে যেখানে বলা হয়েছে, 'কালা আবু হানিফাতা', 'হাযা এনদা আবি হানিফাতা', 'আন আবি হানিফাতা','হাযা-কওলো আবি হানিফাতা' সেগুলো ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর কিনা।

আর জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব জীবনে কোনোদিন উপরিউক্ত গ্রন্থগুলি পড়ে দেখেছেন কিনা সন্দেহ।

জনাব বর্ধমানী সাহেব এখনো যদি মনে করেন যে, হিদায়া গ্রন্থে সনদের উল্লেখ করা নেই বলে তা মানা যাবে না, তাহলে আমরা বলব, আপনারা বুখারী শরিফের হাদিশকে সব থেকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন, সেই বুখারী শরিফেও ১৩০০ হাদিশ এমন আছে, যার কোন সনদ ইমাম বুখারী (রহঃ) উল্লেখ করেন নি। তাহলে বুখারী শরীফের ঐ সনদ বিহীন হাদিশগুলোকে কি বর্ধমানী সাহেব 'হিদায়া' গ্রন্থের মত অস্বীকার করে বসবেন ? হয়ত বর্ধমানী সাহেব বলবেন যে, বুখারী শরিফের হাদিশগুলো সহিহ্ হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে আমরাও একথাই বলব, হিদায়া গ্রন্থের সনদবিহীন মাসআলাগুলো ইমাম আ'জম আবু হানিফা (রহঃ)-এর বলে উম্মতের ইজমা হয়ে গেছে। আর সব থেকে বড় কথা হল, আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামাআতের কোন বুজুর্গ হিদায়া গ্রন্থের মাসআলাগুলো ইমাম আ'জম আবু হানিফা (রহঃ)-এর নয় বলে উল্লেখ করেননি। সর্বপ্রথম আবু তাহের বর্ধমানীও তাঁর চেলা-চামুণ্ডারাই উল্লেখ করেছেন।

জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব তাঁর পুস্তকে আরও লিখেছেন, ‘‘আপনাদের হানাফী ম জহাবের প্রাণ প্রিয় কেতাব হিদায়ায় যে আবু হানিফার উক্তি বর্ণিত হয়েছে---তা কোন আবু হানিফার উক্তি ? ইমাম আবু হানিফা নোমান বিন সাবেতের উক্তি ? না আরও যে ১৯ জন ইমাম আবু হানিফার আবির্ভাব ঘটেছিল--যাঁদের নাম আমি উল্লেখ করেছি, তাঁদের উক্তি? আমি বুঝবো কেমন করে ?’’ (কাট হুজ্জতি জওয়াব, পৃষ্ঠা-৫৩)

এই প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি। এখানে আমি এ কথায় বলব যে, তিনি কিতাবগুলো না পড়ে তার স্বরূপ না জেনেই অন্ধকারে ঢিল মেরে খেয়ানত করে নিজ মুখোশ উন্মোচন করেছেন। হিদায়াতে যে ইমাম আবু হানিফার কথা বলা হয়েছে তা ইমাম আযম আবু হানিফা নুমান বিন সাবেতের কথা বলা হয়েছে, যিনি কোরআন, হাদিস সাহাবায়ে কিরামদের ইজমাকে মন্থন করে ফিকাহ শাস্ত্রকে দাঁড় করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ আরও বলা যায় সৈয়দ আহম্মদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) এর পর বহু সৈয়দ আহমদ নামধারী ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। যেমন স্যার সৈয়দ আহমদ খান যিনি আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এখন যদি কেউ বলেন, 'সিরাতে মুস্তাকীম' গ্রন্থে কোন সৈয়দ আহমদের বানী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ? দেওবন্দী হানাফী মজহাবের পূর্বসূরী সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) এর বানী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে না আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খানের বানী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ? এরকম ধরণের প্রশ্ন পাগলের প্রলাপ, কোন প্রশ্ন নয়। কেননা 'সিরাতে মুস্তাকিম' গ্রন্থ লেখার পর স্যার সৈয়দ আহমদ খানের জন্ম হয়। 'সিরাতে মুস্তাকিম' গ্রন্থ স্যার সৈয়দ আহমদ খানের বানী হতেই পারে না।

আর জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব যে উনিশজন আবু হানিফার কথা উল্লেখ করেছেন তাঁরা কোথায় কবে, কত সালে জন্মগ্রহণ করেছেন তা উল্লেখ করেননি।

হিদায়া বুরহানুদ্দিন (রহঃ) ৫৭৩ হিজরীতে লিখতে আর করেন এবং ৫৮৬ হিজরীতে শেষ করেন। এখন আমার জনাব বর্দ্ধমানী সাহেবকে প্রশ্ন, যে উনিশজন আবু হানিফার কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকে ৫৮৬ হিজরীর আগে জন্মগ্রহণ

করেছেন না তার পরে জন্মগ্রহণ করেছেন ? যদি উনিশজন আবু হানিফা ৫৮৬ হিজরীর পরে জন্মগ্রহণ করেছেন তাহলে একথা দিবালোকের মতো পরিস্কার হিদায়ার লেখক যে আবু হানিফার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি বর্দ্ধমানী সাহেব বর্ণনাকৃত উনিশজন আবু হানিফার মধ্যে কেউ নন। আর উনিশজন আবু হানিফা যদি ৫৮৬ হিজরীর আগে জন্মগ্রহণ করেছেন তা নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলিল সনদ সহকারে জানাবেন।

পলটকর দেখো জালিম তামান্না হম ভী রখতে হ্যাঁয়,
অগর তু সঙ্গেমর্মর হ্যায় তো পত্থর হম ভি রখতে হ্যায়।

হানাফী ফেকাহের প্রতি বর্ধমানী সাহেবের অপবাদ ও তার খণ্ডন

জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব হানাফী ফিকাহর বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁর পুস্তকে লিখেছেন, ‘‘আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনাদের অতি প্রিয় হিদায়া গ্রন্থের ১২৯৯ হিজরীর মোস্তফায়ী ছাপার প্রথম খণ্ডের ৪৯৬ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে - যদি কোন ব্যক্তি মুহারিমাৎ আবাদী যথা মাতা, ভগ্নি, নিজের কন্যা, খালা, ফুফু ইত্যাদি স্ত্রীলোককে বিবাহ করে তাঁর সঙ্গে যৌন সঙ্গম করে, তাহলে তার উপর ইমাম আবু হানিফার মতে হদ জারি হবে না।’’ (কাট হুজ্জতি জওয়াব, পৃষ্টা-৫৪)

জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব উপরিউক্ত বক্তব্যের দ্বারা এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে হানাফী মজহাবে মুহামারিৎ আবাদী যথা মাতা, ভগ্নি, নিজের কন্যা, খালা, ফুফু ইত্যাদি

স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হালাল এবং তাঁদের সঙ্গে যৌন সঙ্গম করাও হালাল। যেহেতু ইমাম আবু হানিফার মতে এই কুকর্মকারীর উপর কোনো হদ জারি হবে না। এখানে জনাব বর্দ্ধমানী সাহেবকে একটি কথায় বলব আপনারা আজ পর্যন্ত কোনো হানাফী মজহাবের অনুসারীকে যদি দেখিয়ে দিতে পারেন যে উপরিউক্ত মহিলাগণকে বিবাহ করেছেন এবং তাঁদের সঙ্গে যৌন সঙ্গম করেছেন এবং কোনো হানাফী মুফতী সেটাকে জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছেন তাহলে বর্ধমানী সাহেবের কথার সত্যতা প্রমান হত। কিন্তু দুঃখের বিষয় জনাব বর্দ্ধমানী সাহেবের সে মুরোদ হয়নি।

আসল কথা হল, কোনো পাপের শাস্তি হিসাবে হদ জারি হবে না মানে এই নয় যে সেটা হানাফী মযহাবে হালাল। জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব শুনে রাখুন আমাদের হানাফী ম জহাবটা আপনাদের আহলে হাদিস মজহাবের মতো ঠুন্‌কো মজহাব নয় যে আপনাদের সামান্য আঘাতে ভেঙে যাবে। শুনে রাখুন শরীয়াতের দৃষ্টিতে শাস্তি হল তিন প্রকার। (১) হদ (২) কেশাস ও (৩) তাজির।

১) এক নম্বর হল হদ। হদ বলা হয় সেই পাপের শাস্তিকে যে পাপের শাস্তি কোর আন ও হাদিস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। সুতরাং এককথায় কোরআন এবং হাদিসে কোন পাপের কি শাস্তি হবে তা পরিস্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে তাকে ‘হদ’ বলা হয়। যেমন, চুরি করে নেওয়ার শাস্তি হাত কেটে নেওয়া, কোন অবিবাহিত পুরুষ যদি কুমারী মেয়ের সাথে ব্যভিচার করলে একশ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন। আর বিবাহিত ব্যক্তি কোন বিবাহিতা মহিলাকে যদি ব্যভিচার করলে তাদেরকে প্রথমত একশত বেত্রাঘাত বা তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা প্রভৃতিকে হদ বলা হয়।

২) দুই নম্বর হল কেশাস। কেশাস বলা হয় সেই শাস্তিকে যে শাস্তির অধিকার ব্যক্তির নিজের থাকে। যেখানে অন্য কারো কিছু বলার থাকে না। যেমন, কোনো ব্যক্তি যদি কারো দাঁত ভেঙে দেয় তাহলে যার দাঁত ভেঙে দেওয়া হয়েছে তার অধিকার হল যে তার দাঁত ভেঙেছে তারও দাঁত ভেঙে দেওয়া। যদি কেউ কারো হাত কেটে দেয় তাহলে যার হাত কাটা হয়েছে তার অধিকার হল যে তার হাত কেটেছে তারো হাত কেটে দেওয়া। শরিয়ত সম্মতভাবে একে 'কেশাস' বলা হয়।

৩) তিন নম্বর হল তাজির। তাজির বলা হয় সেই শাস্তিকে যেটা হদও নয় এবং কেশাসও নয়। অর্থাৎ যে শাস্তির অধিকার কাজী, হাকিম বা বিচারকের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাকে তাজির বলা হয়। এখানে বিচারক পাপীর শাস্তি বেশীও দিতে পারেন এবং কমও দিতে পারেন। সেটা বিচারকের উপর নির্ভর করে।

আর এদিকে দেখা যায়, কেউ যদি মুহারিমাৎ আবাদী যথা মাতা, ভগ্নি, নিজের কন্যা, খালা, ফুফু ইত্যাদি স্ত্রীলোককে বিবাহ করে তাহলে তার কি শাস্তি হবে তা কোরআন ও হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তাই ইমামে আযম আবু হানিফা (রহঃ) বলেছেন, তাদের উপর কোনো হদ জারি হবে না। অর্থাৎ কোরআন হাদিস অনুযায়ী তার কোন নির্ধারিত শাস্তি জারি হবে না। তাজির করা হবে অর্থাৎ বিচারক তার ইচ্ছামত শরিয়ত সম্মত ভাবে উপযুক্ত শাস্তি দিবেন। এমন কি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্তও দিতে পারেন। আর হিদায়া গ্রন্থ পাঠ করলে দেখা যায় সেইসব ব্যক্তিগণের জন্য যারা উপরিউক্ত কুকর্ম করে তাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের কথাও বলা হয়েছে। অর্থাৎ তার শাস্তি হিসাবে তাজিরের কথা বলা হয়েছে।

জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব যদি জীবনে কোনো দিনও হিদায়া গ্রন্থটি পড়ে থাকতেন তাহলে তিনি অবশ্যই উপরিউক্ত কুকর্মকারীর শাস্তি হিসাবে তাজিরের বর্ণনা পেতেন। আর জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব যদি মনে করেন কোন ব্যক্তি যদি মুহারিমাৎ আবাদী মাতা, ভগ্নি, নিজের কন্যা, খালা, ফুফু ইত্যাদি স্ত্রীলোককে বিবাহ করে তার সঙ্গে যৌন সঙ্গম করে তার উপর হদ জারি হবে। তাহলে তার হদটা কি হবে তা কোরআন ও সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণ করার আবেদন রাখলাম।

জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব হানাফী ফিকাহর বিরোধিতা করতে গিয়ে আরও লিখেছেন, "আরও দেখছি আপনাদের মুনিয়াতুল মুসাল্লী নামক ফেকার কিতাবে বোম্বাইয়ের মুহাম্মদী ছাপার ৪র্থ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে---অর্থাৎ কুকুর ও হোঁড়ল জবাই করলেই তার চামড়া পাক হবে।" (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা-৫৪)

উত্তরে বলি, কুকুর ও হোঁড়ল জবাই করলে তার চামড়া পাক হয়ে যাবে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে। হাদিস শরীফে আছে, 'কুল্লু ইহাবিন ইযা দোবেগা তহুরা" অর্থাৎ কাঁচা চামড়া দাবাগাত দিলেই পাক হয়। সুতরাং এখানে কুকুর ও হোঁড়লকে যদি জবাই করে তার চামড়াকে দাবাগাত দিয়ে পাক করা হয় তাহলে তাদের চামড়াও ব্যবহার করা যাবে। আপনারা তো গায়ের জোরে শুকরকেও পাক বলে দিয়েছেন। অথচ শুকর দাবাগাত দিলেও পাক হয় না। মানুষ এবং শূকর ছাড়া পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে প্রত্যেক প্রাণীর চামড়াই দাবাগাত দ্বারা পাক করলে সেটা ব্যবহার করা যাবে। দাবাগাত হল একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোন প্রাণীর চামড়াকে শুকিয়ে পাক করা হয়। সুতরাং কুকুর ও হোঁড়লকে যদি জবাই করে তার চামড়াকে দাবাগাত

দেওয়া হয় তাহলে তার চামড়াও পাক হয়ে যাবে তাতে আপত্তি করার কি আছে ? সে দাবাগাত রোদে শুকিয়ে হোক বা কোন ওষুধের মাধ্যমেই হোক।

জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব তাঁর উক্ত পুস্তকে ব্রেকেটের মধ্যে লিখেছেন, "সুতরাং সে চামড়ায় বিনা দাবাগতেই নামাজ দোরস্ত হবে।" কিন্তু জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব হানাফী ফিকাহ মুনিয়াতুল মুসল্লী, শরহে বিকায়া, হিদায়া, ফতোয়ায়ে আলমগিরি প্রভৃতি হানাফী গ্রন্থে যদি দেখিয়ে দিতে পারতেন, বিনা দাবাগাত কুকুর ও হোঁড়ল জবাই করলে তার চামড়া পাক হয়ে যাবে এবং সেই চামড়ায় নামাজ পড়া দোরস্ত হবে তাহলে আমি তাঁকে বাহাদুর বলে মনে করতাম। কিন্তু জনাব বর্দ্ধমানী সাহেবের সে মুরোদ হয়নি। তিনি হানাফী ফিকাহ সম্পর্কে কতকগুলি গাঁজাখুরি কথা লিখে নিজ পুস্তকের পৃষ্ঠাগুলোকে কলঙ্কিত করেছেন এবং পাঠক সমাজকে বিভ্রান্ত করার জঘন্য প্রয়াস করেছেন মাত্র। আমার তরফ থেকে জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী তথা সমগ্র আহলে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদিন সম্প্রদায়কে চ্যালেঞ্জ রইল, বিনা দাবাগতে কুকুর ও হোঁড়ল জবাই করা হলে তার চামড়া পাক হয়ে যাবে ও তার চামড়ায় নামাজ পড়া দোরস্ত হবে একথা কোন হানাফী ফিকাহ গ্রন্থে দেখাতে পারেন তাহলে এক লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার দানের ওয়াদা রইল। যদি হিম্মৎ হয় তাহলে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন।

জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব তাঁর উক্ত জঘন্য পুস্তকে হানাফী ফিকাহর বিরোধিতা করতে গিয়ে লিখেছেন, "আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি, আপনাদের শারহে বিকায়া কেতাবের লখনৌ--এর ইউসুফী ছাপার ১ম জেলেদের ২৩৮ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে---অর্থাৎ যদি কোন লোক মৃত স্ত্রীলোকের অথবা চতুষ্পদ জন্তুর স্ত্রী অঙ্গে বা

অন্য কোন দ্বারে রোযার অবস্থায় বলাৎকার করে তাহলে তার রোযা নষ্ট হবে না।” (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা ৫৫)।

উত্তরে এ কথায় বলব, যদি কোন লোক মৃত স্ত্রীলোকের অথবা চতুষ্পদ জন্তুর স্ত্রী অঙ্গে বা অন্য কোন দ্বারে রোযার অবস্থায় বলাৎকার করে তাহলে তার রোযা নষ্ট হবে না---এতে আপত্তি করার কি আছে ? আসল ফতোয়া হল, যদি কোন লোক উপরিউক্ত কুকর্ম করে থাকে এবং যদি বীর্যপাত না হয় তাহলে রোযা নষ্ট হবে না, আর যদি বীর্যপাত হয়ে যায় তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, কোরআন ও সহীহ হাদিসে কোথাও একথা প্রমাণিত নয় যে যদি কোন ব্যক্তি উপরিউক্ত কুকর্ম করে আর যদি বীর্যপাত না হয় তাহলে এই কুকর্মকারীর রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই হানাফী ফিকাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, যদি কোন লোক মৃত স্ত্রীলোকের অথবা চতুষ্পদ জন্তুর স্ত্রী অঙ্গে বা অন্য কোন দ্বারে রোযার অবস্থায় জ্বেনা করে তাহলে তার রোজা নষ্ট হবে না এদিকে আমরা দেখতে পায়, জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব তাঁর উক্ত কুখ্যাত পুস্তকে কোরআন শরীফের আয়াত বা সহীহ হাদিস সনদ সহকারে উল্লেখ করেননি যে উক্ত কুকর্মকারীর রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। যদি তিনি কোরআন শরীফের আয়াত বা সহীহ হাদিস সনদ সহকারে দেখিয়ে দিতে পারতেন যে উপরিউক্ত কুকর্মকারীর রোযা ভেঙে যাবে তাহলে আমরা জনাব বর্দ্ধমানী সাহেবের ফতোয়া মেনে নিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্দ্ধমানী সাহেব তো দূরের কথা তাঁর বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ দেখতে পারেন নি এবং তাঁর এবং তাঁর মন্ত্রশিষ্যরাও কোনোদিন দেখাতে পারবে না ইনশাল্লাহ। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁরা এটা প্রমাণ করতে ব্যর্থ থাকবেন। তাঁরা যেন কোরআন শরীফের আয়াত ও সনদ সহকারে নাসেক সহীহ হাদিসের মাধ্যমে উক্ত মসলার সমাধান করেন, তাহলে বড়ই আনন্দিত হব।

জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব হানাফী ফিকাহার বিরোধিতা করতে গিয়ে আরও লিখেছেন, “আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি, দেখছি, হিদায়া মোস্তাফায়ী ছাপার প্রথম জেলেদের ২৯৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে, অর্থাৎ কোন স্ত্রীলোক মিথ্যা করে বলে যে অমুক ব্যক্তি আমাকে বিবাহ করেছে এবং তার মিথ্যা প্রমাণও পেশ করে। তাহলে কাযী ঐ প্রমাণ অনুযায়ী স্ত্রীলোকটিকে ডিগ্রী দিলে ইমাম আবু হানিফার মতে উক্ত স্ত্রীলোক ঐ ব্যক্তির সাতে (এখানে ‘সাতে’ হবে না ‘সাথে হবে, হতে পারে জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব বানান ভুলে লিখেছেন কিংবা প্রেসে বানান ভুল হয়ে গেছে) একত্রে বাস করতে ও ঐ লোকের দ্বারা যৌন মিলন করাইতে পারে।” (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা-৫৫)

উত্তরে বলব, আমি মনে করি এখানেও জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী ও তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেদের কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। আমরা জানি, বিবাহের শর্ত হল তিনটি। ১) দেনমোহর আদায় ২) ইজাব কবুল এবং ৩) দুজন সাক্ষী প্রমাণ। সুতরাং কোন স্ত্রীলোক যদি মিথ্যা করে বলে। অমুক ব্যক্তি আমাকে বিবাহ করেছে এবং দুজন সাক্ষী যদি সে পেশ করে এবং কাযী যদি নির্দিষ্ট দেনমোহরের বিনিময়ে ডিগ্রি দিয়ে দেন এবং উক্ত ব্যক্তি যদি তা মেনেও নেয় তাহলে তো উভয়ের মধ্যে বিবাহ হয়ে গেল। আর বিবাহ হয়ে যাওয়ার পর যদি উক্ত স্ত্রীলোক ঐ ব্যক্তির সাথে একত্রে বসবাস করে এবং ঐ লোকের দ্বারা যৌন মিলন করায় তাহলে জনাব বর্দ্ধমানী সাহেবের আপত্তি হওয়ার কি আছে ? তা কুরআন হাদিশ দ্বারা প্রমান করলে ভাল হত।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়। মনে করুন, কোনো লোক গলায় দড়ি নিয়ে আত্মহত্যা করে মারা গেছে। এখন যদি দুজন সাক্ষী বিচারকের সামনে প্রমাণ পেশ করে বলে, অমুক ব্যক্তি একে হত্যা করেছে। আর বিচারকের যদি দুজন সাক্ষীর প্রমাণ দ্বারা শরীয়াতী শাস্তির ডিগ্রী দেন। তাহলে যার সম্পর্কে মিথ্যা করে বলা হয়েছে, যে এই ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছে, তার বাহ্যিক বিচার হবে, আল্লাহর বিচারে স্বাক্ষীগন পাপী হবে।

ঠিক সেই রকম, যদি কোন স্ত্রীলোক মিথ্যা করে বলে যে অমুক ব্যক্তি আমাকে বিবাহ করেছে এবং তার মিথ্যা প্রমাণও পেশ করে। তাহলে কাযী ঐ প্রমাণ অনুযায়ী স্ত্রীলোকটিকে ডিগ্রী দিয়ে দেন তাহলে ঐ লোকটির জন্য ওয়াজীব কাযীর ডিগ্রী মেনে নিয়ে ঐ স্ত্রীলোকটির সঙ্গে একত্রে বসবাস করা জায়েজ, যতক্ষণ না সে নিজের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করতে না পারে আর শরিয়ত অনুসারে পূর্বে যদি বিবাহ না হয়ে থাকে, কাজীর বিবাহের ডিগ্রী বিবাহ হিসাবে গন্য হবে। কিন্তু স্ত্রীর মিথ্যা বায়ানের জন্য তার পাপ অব্যাহত থাকবে।

উদাহরণ স্বরূপ আরও বলা যায়, মনে করুন কোন লোক মহিলাকে নিয়ে বিবাহের দৃশ্য নিয়ে কোন নাটকে অভিনয় করেছেন। যাতে দেনমোহর আদায়, দুজন সাক্ষী ও ইজাব কবুলের দৃশ্য ছাড়া আর কিছু নাই এবং ঐ বিবাহের দৃশ্য যদি উক্ত মহিলাটি যাকে নিয়ে বিবাহের দৃশ্য নিয়ে অভিনয় করা হয়েছে সেই মহিলাটি যদি ভিডিও ক্যামেরায় রেকর্ডিং করে নেয়। এরপর যদি ঐ মহিলাটি কোন আদালতে গিয়ে ভিডিও ক্যাসেটের রেকর্ডিং দেখিয়ে প্রমাণ স্বরূপ বলে, ঐ লোকটি আমাকে বিবাহ করেছে, আর আদালতের বিচারক যদি ঐ মহিলাটির প্রমাণ অনুযায়ী ডিগ্রী দিয়ে দেন তাহলে

ঐ লোকটির জন্য আদালতের বিধান মান্য করা কর্তব্য হয়ে যাবে। তবে আল্লাহর আদালতে দোষী থাকবে।

সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর ফতোয়ার কোন ভুল নেই জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেবের বুঝার ভুল।

পরিশেষে আমরা একটি কথায় বলব, জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব ও তাঁর গায়ের মুকাল্লিদীন আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি হিম্মৎ হয় তাহলে কোর আন শরীফের আয়াত ও সনদ সহকারে সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণ করে দিন যে যদি কোন স্ত্রীলোক মিথ্যা করে বলে অমুক ব্যক্তি আমাকে বিবাহ করেছে এবং তার মিথ্যা প্রমাণও পেশ করে। তাহলে কাযী ঐ প্রমাণ অনুযায়ী স্ত্রীলোকটিকে ডিগ্রী দিলে উক্ত স্ত্রীলোক ঐ ব্যক্তির সাথে একত্রে বসবাস করতে এবং ঐ লোকের দ্বারা যৌন মিলন করাইতে পারবে না। যদি প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে কাট হুজ্জতি ছাড়ুন এবং ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর উক্ত ফায়সালা মেনে নিন।

জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব তাঁর উক্ত পুস্তকে আরও লিখেছেন, ‘‘আরও আমরা দেখছি হিদায়া ১২৯৯ হিজরীর মোস্তাফায়ী ছাফার (এখানে ‘ছাফা’ হবে না ‘ছাপা হবে, হতে পারে জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব ভুল বানান লিখেছেন কিংবা প্রেসে ভুল বানান হয়ে গেছে) ৪৮১ পৃষ্ঠায় রয়েছে---অর্থাৎ গম, যব, মধু, জোয়ার হতে যে মদ প্রস্তুত করা হয়, তা ইমাম আবু হানিফার নিকট পান করা হালাল। এবং এই সকল মদ পানকারী লেকের (এখানেও ‘লেকের’ হবে না ‘লোকের’ হবে, হতে পারে

এখানেও প্রেসে বানান ভুল হয়ে গেছে।) নেশা হলেও হদ মারা হবে না।” (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা-৫৬)

উত্তরে আমরা এক কথায় বলব, হেদায়া গ্রন্থটি বুরহানদ্দীন বিন আবী বকর মুর্গীনান (রহঃ) আরবীতে লিখেছেন। আর আরবী মদকে বলা হয় ‘খামর’। কিন্তু মূল হিদায়া গ্রন্থের আরবী এবারতে লেখা আছে ‘নাবিয’। এখানে আমাদের প্রশ্ন, ‘খামার’ আর ‘নাবিয’ এই আরবী শব্দ দুইটি কি এক ? দুটি আরবী শব্দের বাংলা অনুবাদ কি মদ ! ‘খামর’ বলা হয় সেইসব মাদক দ্রব্যকে যার মধ্যে অ্যালকোহল থাকে ও আঙ্গুরের রসের তৈরী মাদক দ্রব্য যা পান করা ইসলামী শরীয়াতে প্রকাশ্য হারাম। আর দ্বিতীয় হল ‘নাবিয’ এক ধরণের সরবত যা ইসলামী শরীয়াতে পান করা হারাম নয়, হালাল। এবং ‘নাবিয’ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও পান করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামও পান করতেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে খেজুরকে পানিতে ভিজিয়ে রাখা হত এবং সেই পানিকে বলা হত ‘নাবিয’। এই খেজুরকে পানিতে ভিজিয়ে রাখার ফলে পানি মিষ্টি হয়ে যেত। যা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও পান করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামরাও পান করতেন। যা শরীয়াতে কোনদিনই হারাম বলে ঘোষণা করা হয়নি। আর জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব যদি হিদায়া গ্রন্থের ‘নাবিযে’র অনুবাদ মদ করে খেয়ানত করে থাকেন তাহলে আমাদের কিছু করার নেই।

সুতরাং আরবী হিদায়া গ্রন্থের আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ হবে গম, যব, মধু, জোয়ার হতে যে নাবিয (সরবত) প্রস্তুত করা হয় তা ইমাম আবু হানিফার নিকট হালাল। আর সরবত পান করাকেও যদি আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব তথা গায়ের মুকাল্লিদ্দীন সম্প্রদায় হারাম বলে মনে করেন তাহলেও আমাদের কিছু করার নেই।

এই সকল নাবিয (সরবত) পানকারী লোকের যদি নেশাও হয় তাহলেও হদ মারা হবে না। কেননা গম, যব, মধু, জোয়ার হতে যে নাবিয প্রস্তুত করা হয়, তার হদ মারা হবে সেটাও কোরআন ও সহী হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তাই ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেছেন, এই সকল 'নাবিয' পানকারী লোকের নেশা হলেও হদ মারা হবে না, হ্যাঁ, যদি সেটিতে নেশা সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে নেশা পরিমান পান করা হারাম, তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, হদ কেবল মদের জন্য তার দ্বারা নেশা হোক অথবা না হোক। খামর ছাড়া অন্য কোন নেশার জন্য হদ নির্ধারন হাদিসে নেই। ইমাম আবু হানিফা কোরআন হাদিসের বিধানের সীমাগুলির কত সঠিকভাবে নির্ধারন করেছেন। নিজের মত ঢুকিয়ে সীমালঙ্ঘন করেননি।

তাই আমি এখানে আবু তাহের বর্দ্ধমানী ও তাঁর সমগ্র গায়ের মুকাল্লিদ্দীন আহলে হাদিস সম্প্রদায়কে বলব, গম, যব, মধু, জোয়ার হতে যে নাবিয (সরবত) প্রস্তুত করা হয় তা যদি আপনাদের নিকট হারাম হয় তাহলে কোরআন ও সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণ করুন। আর দয়া করে এটাও প্রমাণ করবেন উপরিউক্ত পানীয় দ্রব্য পানকারীর কি হদ মারা হবে ? আর একথাও বলব, জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব যে আরবী 'নাবিয' শব্দের বাংলা অনুবাদ যে 'মদ' করেছেন তা কোন আরবী-বাঙলা লুগাতে (অভিধান) রয়েছে। তা পৃষ্ঠা নম্বর সহ জানাবেন দয়া করে।

যদি কেউ জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেবের 'কাট হুজ্জতির জওয়াব' পুস্তকখানি পড়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয় দেখতে পাবেন তিনি জনৈক বাংলাদেশী মাওলানা আইউব হোসেন সাহেবের 'সত্যের অপলাপ' পুস্তকের তীব্র প্রতিবাদ করে লিখেছেন।

জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব তাঁর ‘কাট হুজ্জতির জওয়াব’ পুস্তকে আইউব হোসেন সাহেবের ‘সত্যের অপলাপ’ পুস্তকের ‘জায়েযুন’ আর ‘বিদায়ান’ দুটি আরবী শব্দের ব্যাকরণ গত ভুল ধরতে গিয়ে যে হট্টগোল করেছেন তা জনাব বর্দ্ধমানী সাহেবের উক্ত পুস্তকের প্রত্যেক পাঠক মাত্রেই জানেন। যদিও আইউব হোসেন সাহেব স্বীকার করেছেন, ‘‘আমি ‘জায়েযুন’ আর ‘বিদায়ান’ লিখেছিলাম কিন্তু প্রেসে গিয়ে জায়েয়ুন---জায়েযান হয়ে গেছে আর বিদায়ান--বিদায়াতুন হয়ে গেছে।’’ আইউব হোসেন সাহেবের এই ভুল স্বীকারোক্তির পরেও জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব তাঁকে ক্ষমা করেন নি। তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ করতে গিয়ে লিখেছেন, ‘‘এখানে তিনি (আইউব হোসেন) শাক দিয়ে মাছ ঢাকার ফন্দি অঁটেছেন। আমি আল্লাহর মেহেরবানীতে কলকাতা থেকে ‘মাসিক তাওহীদ’ ও দিনাজপুর থেকে ‘মাসিক আল-মুজাহিদ’--এই দু’খানা পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম। অর্ধ সাপ্তাহিক পয়গাম ও সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর সাথে এক যুগের অধিককাল আমি জড়িত ছিলাম। বই পুস্তকও খান পনেরো লিখে প্রকাশ করেছি। তাই আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি, মৌলানা আইউব হোসেনের কৈফিয়ত যে ‘জায়েযুন’ শব্দটাকে প্রেসের কম্পোজিটার ‘জায়েযান’ বানিয়ে দিয়েছে একথা বিশ্বাসযোগ্য হতেই পারে না। অবশ্য ু চিহ্ন হতে পারে বা ী চিহ্ন হতে পারে অনুরূপভাবে া চিহ্নটা। চিহ্ন হতে পারে বা ম্যাশিনম্যানের অসাবধানতায় অক্ষর ডুবে থাকলে কোনটাই না উঠতে পারে বা অস্পষ্ট হতে পারে। তাই বলে া চিহ্নটা ু চিহ্ন হয়ে যাওয়া ও ু চিহ্নটা া চিহ্ন হয়ে যাওয়া আর ‘য়া’ ও ‘ন’ এই দুই অক্ষরের মাঝখানে একটা ‘তু’ অক্ষর বৃদ্ধি পাওয়া অসম্ভব। তবু তিনি প্রেসের কম্পোজিটারের উপর ষোল আনাই দোষ চাপিয়ে দিয়ে পাক পবিত্র হয়ে গেলেন। তিনি এখন বলছেন আমি যা লিখেছি প্রেসে যেয়ে তা গোলমাল হয়ে গেছে।’’ (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা-৫-৬)

আমি এখানে বলব, জনাব আইউব হোসেন সাহেব তাঁর ‘সত্যের অপলাপ’ পুস্তকে ‘জায়েযুন’ আর ‘বিদায়ান’ এই দুই আরবী শব্দের কি ব্যাকরণগত ভুল লিখেছেন বা আইউব হোসেন সাহেবের কথা অনুযায়ী প্রেসে যেয়ে সব গোলমাল হয়ে গেছে সেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমার বক্তব্য হল, জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব এখন যদি আরবী-বাংলা অভিধানে আরবী ‘নাবিয’ শব্দের অনুবাদ যদি ‘মদ’ দেখাতে না পেরে বলেন, ভাইজান! আমি ওখানে ‘নাবিয’ শব্দের বাংলা অনুবাদ সরবত কিংবা ঐ জাতীয় কিছু একটা করেছিলাম, কিন্তু প্রেসে গিয়ে তা গোলমাল হয়ে গেছে। তাহলে আমরাও তাঁর এই মদখোর মাতালের মতো মাতলামী পূর্ণ কথাকে বিশ্বাস করব না। তার কারণ ‘সরবতটা’ কিভাবে প্রেসে গিয়ে ভুল করে ‘মদ’ হয়ে যায় তা আমাদের বুঝে আসে না। দয়া করে বুঝিয়ে দেবেন।

কথিত আছে, জনৈক ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এক আর এক কয়টি হয় ? উত্তরে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিটি বলেছিল, দুইটি রুটি। জনাব আবু তাহের বর্ধমানী সাহেবের অবস্থাও দেখছি তাই। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখেছেন,

“ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়,
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।”

তাই আমি আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেবকে বলি, বেশী আস্ফালন করবেন না। কেননা ভারবর্ষ হল হানাফীদের স্টেজ, এখানে গায়ের মুকাল্লিদীনদেরকে অপারেশন করা হয় না, পোস্ট মার্টম করা হয়। কি বুঝলেন ?

জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব আইউব হোসেন সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, “তিনি দু’লাইন আরবী লিখতে গিয়ে যে সাত জায়গায় ভুল করেছেন আমার সেই ভুল ধরাটাকে তিনি ‘ব্যাকরণ লংঘিত বকওয়াস’ বলে অভিহিত করে খুবই বগল বাজিয়েছেন। এবং আমাকে তার মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করার জন্য উপদেশ খয়রাত করেছেন। আমি তার এই মেহের বানীতে খুবই খুশী হলাম। তবে তার ক্লাশে গিয়ে আমি যদি বসি তাহলে তার কাপড়-চোপড় ঠিক থাকবে কিনা তাই ভাবছি।” (কাট হুজ্জতি জওয়াব, পৃষ্টা-৫)

এখানে বর্ধমানী সাহেব নিজের অহংকারকে প্রকাশ করেছেন।

জনাব আবু সাহেব তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব হানাফী ফিকাহার আরও বিরোধিতা করতে গিয়ে লিখেছেন, “আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি আপনাদের দুররে মোখতার নামক কিতাবের ৩৬ পৃষ্ঠায় বাবুল আনজাসে লেখা রয়েছে, অর্থাৎ অঙ্গুলি ও স্ত্রীলোকের স্তন (মলমূত্র দ্বারা নাজাস বা নাপাক হয়ে) তিনবার জিব দিয়ে চেঁটে দিলে পাক হয়ে যাবে।” (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা-৫৬)

আমি ভেবে পাচ্ছি না এখানে জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেবের আপত্তি করার কি আছে ? এখানে তা চেটে পাক করার কথা বলা হয়নি কেবল বলা হয়েছে যে, অঙ্গুলি হোক আর স্ত্রীলোকের স্তন হোক তিনবার জিব দিয়ে চেটে দিলে পাক হয়ে যাবে। কেননা, যেভাবেই হোক নাজাসাত বা নাপাক মানুষের অঙ্গ থেকে দূরীভূত হয়ে গেলেই সেই জায়গাটা পাক হয়ে যায়। সেটা জিব দিয়ে চেটেই বা পানি দিয়ে ধুয়েই

হোক। এই মশআলাটি কি ভুল ? তাহলে কোরআন-হাদিস পেশ করে ভুল প্রমাণ করলেন না কেন? মানুষের অঙ্গে যতক্ষণ নাজাসাত লেগে থাকে ততক্ষণ সেই জায়গাটা নাপাক হয়ে থাকে আর সেখানে জিব দিয়ে চেটে নাজাসাত পাক করার কথা বলা হয়েছে মানে এই নয়, যে অঙ্গে নাজাসাত লেগে থাকলেই সেটা জিভ দিয়ে চেটে পাক করতে হবে। যদি পানি বা অন্য কোনো পাক করার জিনিস মওজুদ থাকে তাহলে পানি দিয়ে বা অন্য কোনো জিনিস দিয়ে পাক করতে হবে। যদি পানি বা অন্য কোন পাক করার জিনিস না পাওয়া যায় তাহলে কেউ যদি তিনবার নাজাসাত লাগা অঙ্গে জিব দিয়ে চেটে দেয় তাহলে সেটা পাক হয়ে যাবে।

সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে, দূররে মোখতার কেতাবে মশলায় কোন ভুল নেই। আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেবের বোঝার ভুল। এখন কেউ যদি ভুল বোঝার পরও না বোঝার ভান করে তাহলে আমার কিছু করার নেই।

আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব তাঁর পুস্তকে হানাফী ফিকাহার বিরোধিতা করতে গিয়ে আরো লিখেছেন, “আমরা আরও দেখেছি আপনাদের হিদায়ার মোস্তাফায়ী ছাপার ২য় খণ্ডের ৫৮৩ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে---অর্থাৎ মদ যদি সিরকা হয়ে যায় বা তাতে কোন জিনিস মিশিয়ে যদি সিরকা বানানো হয় তবে তা হালাল।” (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা-৫৬)

আমি মনে করি এখানেও জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেবের আপত্তি করার কোন কারণ থাকতে পারে না। মদ বা তাতে কোন জিনিস মিশিয়ে যদি সিরকা বানানো হয় তবে তা অবশ্যই হালাল হয়ে যাবে। কেননা মদকে একবার সিরকা

বানিয়ে দিলে সেটা আর মদ থাকে না। সেটা সিরকা হয়ে যায়। যেমন মদে নুন মিশিয়ে দিলে সেটা সিরকা হয়ে যায় এবং তার মধ্যে কোন নেশা বাকী থাকে না অর্থাৎ মদের হকিকতটাই পরিবর্তন হয়ে যায়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চাচা কিংবা মামা মারা যাওয়ার পর বা তাদের স্ত্রীদিগকে তালাক দেওয়ার পর নির্দিষ্ট ইদ্দতকাল পেরিয়ে যাওয়ার পর চাচা কিংবা মামার স্ত্রীদিগকে ভাইপো বা ভাগ্নের জন্য বিয়ে করা শরীয়াতে হালাল। কেননা চাচা বা মামা মারা যাওয়ার পর বা তারা তাদের স্ত্রীদিগকে তালাক দেওয়ার পর উক্ত মহিলাদের সঙ্গে ভাইপোর জন্য চাচীর সম্পর্ক এবং ভাগ্নের জন্য মামীর সম্পর্ক আর বজায় থাকে না তা ছিন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ সম্পর্কের হকীকতটাই পরিবর্তন হয়ে যায়। সেজন্য উক্ত মহিলাদিগকে বিয়ে করা হালাল।

ঠিক সেই রকম মদ যদি সিরকা হয়ে যায় তাহলে মদের হকীকতটাই পরিবর্তন হয়ে যায়, সেটা আর মদ থাকে না, সেজন্যই মদ সিরকা হয়ে যাওয়ার পর সেটা হালাল।

সুতরাং এর পরেও আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব যদি বুঝতে না পারেন তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। আর বোঝার পরও হানাফীদের সিরকা পান করা দেখে যদি বর্দ্ধমানী সাহেবের লোভাতুর হয়ে মাথা গরম করে মাতালের মতো আবোল তাবোল বকতে আর করেন তাহলে তাঁর মাতলামি ছাড়াবার ওষুধও আমাদের কাছে ম ওজুদ আছে। তা যথাসময়ে পেয়ে যাবেন।

আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব হানাফী ফিকাহার বিরোধিতা করতে গিয়ে আরও লিখেছেন, “আপনাদের ফতোয়ায় কাযী খাঁ নওল কেশরী ছাপার ১ম খণ্ডের ১১০ পৃষ্ঠায় দেখতে পাচ্ছি লেখা রয়েছে-অর্থাৎ স্ত্রী নিদ্রিত ও পাগলিনী অবস্থায় তার স্বামী (রোযার অবস্থায়) যৌনমিলন করলে কাফ্ফার লাগবে না। আর ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ইমাম সোফর বলেছেন দুই জনেরই রোজা নষ্ট হবে না।” (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা-৫৬)

এর উত্তর আমি আগেই দিয়েছি। আগেই বলেছি, যৌন মিলন করার পর যদি বীর্যপাত না হয় তাহলে রোঝা নষ্ট হবে না। আর রোযা নষ্ট না হলে কাফ্ফারাও লাগবে না। সুতরাং স্ত্রী নিশ্রিত ও পাগলিনী অবস্থায় তার স্বামী রোযার অবস্থায় যৌন মিলন করলে কাফ্ফরা লাগবে না। এই মশআলা কি কোরআন হাদিস বিরোধী ? তাহলে তিনি কোরআন হাদিসের দলীল পেশ করলেন না কেন ? তাহলে আপনার কলমের শক্তি যাঁচাই করা যেত।

আমরা জানি, আবু তাহের বর্দ্ধমানী হলেন সেই দলের লোক যাঁরা কোরআন ও সহীহ হাদিস ছাড়া কিছু মানেন না। তাহলে এখানে কেন তিনি কোরআন ও সহীহ হাদিস দ্বারা উক্ত মশলার সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হলেন। এর উত্তর গায়ের মুকাল্লিদিন আহলে হাদিসদের কাছে আছে কি ?

ইমাম আবু হানিফার শানে বর্ধমানী সাহেবের মারাত্মক গুস্তাখী

আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব তাঁর কুখ্যাত পুস্তকে 'তারিখে বাগদাদী' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা (রহ) এর শানে মারাত্মক গোস্তাখী করে লিখেছেন ঃ 'মালেক বিন আনাস বলেন, দুই দিক দিয়ে আবু হানিফার ফেতনা ইবলিশ শয়তানের চেয়ে মারাত্মক। ইর্জার ফেতনা ও দাঁতের বদলে দাঁত ভাঙার বিরোধিতার ফেতনা। তিনি বলেন আব্দুর রহমান বিন মাহদীকে বলতে শুনেছি যে, দাজ্জালের ফেতনার পরে অত্যধিক বড় ফেতনা ইসলামের সেই ফেতনা তাছাড়া আমার আর জানা নেই।" (কাট হুজ্জতি জওয়াব, পৃষ্টা-৮৬)

এখানে আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর শানে যে মারাত্মক গুস্তাখী করেছেন তা কোনোদিন ক্ষমার যোগ্য নয়। তিনি ইমাম মালেক (রহঃ) এর নাম নিয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কে ইবলিশ শয়তানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অথচ কোনদিন ইমাম মালেক (রহঃ) ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর শানে এরকম ধরণের কথা বলেন নি।

একবার ইমাম মালেক(রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "আবু হানিফাকে দেখেছেন?" উত্তরে ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছেন, "আমি এমন এক যুবককে (আবু হানিফা) দেখেছি তিনি যদি খুঁটিকে সোনা বলে প্রমাণ করতে চান তাহলে তিনি দলিলের মাধ্যমে তা পারতেন।"

সুতরাং এখানে জনাব বর্দ্ধমানী সাহেবের যুক্তি ধোপে টিকে না।

তিনি আরও লিখেছেন, "ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ইসলামের মধ্যে আবু হানিফার মতো খারাপ সন্তান আজ পর্যন্ত জন্মলাভ করেনি।" (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা-৮৬)

অথচ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর ধরণের কথা কোনদিন বলেন নি। তাঁকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, "আবু হানিফার সম্পর্কে কিছু জানেন ?" উত্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছিলেন, 'মান আরাবাই ইয়ারাফাল ফিকাহ ফাল ইয়ালজাম আবা হানিফাতা ওয়া আসহাবাহু ফা ইন্নাল নাসা কুল্লাহাম ইয়ালুন আলাইহি ফিকহে' অর্থাৎ লোকসকল ধর্মীয় ব্যাপারে যদি কোন জ্ঞান অর্জন করতে চাও তাহলে আবু হানিফা ও তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে মিশে যাও। ইমাম আবু হানিফার পরে যত উলামা আসবেন তাঁদের সকলের চাইতে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বেশী মর্যাদাবান।"

সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (রঃ) কোনদিন ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কে খারাপ সন্তান বলেন নি। তিনি যদি তা বলতেন তাহলে তিনি ইমাম আবু হানিফার পরবর্তী কালের উলামাদিগের চেয়ে বেশী মর্যাদাবান বলতেন না। সুতরাং এগুলি আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেবের হিংসাজনিত মনগড়া কথা।

জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব আরও লিখেছেন, "ইমাম হাম্মাদ বিন যায়েদ ও সুফিয়ান এবনো আওন বলেছেন, আবু হানিফার মত ইসলামের অত্যাধিক কুলক্ষণা সন্তান আজ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি।" (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্টা-৮৬)

এখানেও আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব নিজের ধাপ্পাবাজী পাঠক সমাজে প্রকাশ করেছেন। সুফিয়ান এবনো আওন (রহঃ) ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কে কুলক্ষণা সন্তান বলেননি। বরং সুফিয়ান ইবনো আওন (রহঃ)কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ‘‘ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে কিছু জান ? উত্তরে সুফিয়ান এবনো আওন (রহঃ) বলেছিলেন, ‘‘মা মাকালাত আইনি মিশলা আবি হানিফা অর্থাৎ ‘‘আমার চোখ আবু হানিফার মত ব্যক্তি দেখেনি।” সুতরাং যিনি বলেন আমার চোখ আবু হানিফার মত ব্যক্তি দেখেনি তিনি কিভাবে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)কে সম্পর্কে বলতে পারেন, আবু হানিফার মত ইসলামের অত্যধিক কুলক্ষণা সন্তান আজ পর্যন্ত জন্মলাভ করেনি ? আসল কথা হল, আবু তাহের বর্দ্ধমানী তথা তাঁর সম্প্রদায়ের গায়ের মুকাল্লিনি লোকেরা যেন তেন ভাবে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর ভাবমূর্তিটাকে কলঙ্কিত করে, মুসলিম সমাজে নিজেদের কলঙ্কময় অধ্যায়গুলি চাপা দিতে চেয়েছেন।

একটু লক্ষ করলে দেখা যায়, জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব কখনো ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কে নিজেদের দলে টেনে আহলে হাদিস বলছেন আবার কখনো বিভিন্ন মুহাদ্দিসিনদের অভিমতকে বিকৃত করে ইবলিশ শয়তানের সঙ্গে তুলনা করছেন। এটা তাঁর দ্বিচারিতা নয় কি ? তিনি লিখেছেন, ‘‘ইমাম আবু হানিফা আহলে হাদিস ছিলেন এবং আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। তবু এখানে একান্ত বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্বেও উক্ত উদ্ধৃতিগুলি আমাকে পেশ করতেই হলো।” (ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা-৮৬) এখানে ইবলিশের সঙ্গে তুলনা করাটা ও অত্যধিক কুলক্ষণা সন্তান বলাটাই কি বর্ধমানী সাহেবের নিকট শ্রদ্ধা ? তাই এখানে জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব যদি সত্যি

সত্যিই ইমাম আবু হানিফাকে শ্রদ্ধা করে থাকতেন তাহলে তিনি কোনদিনই ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কিত উদ্ধৃতিগুলি পেশ করতেন না।

এরপরে বর্দ্ধমানী সাহেব দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘‘আমাকে ওহাবী আখ্যায়িত করে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা যদি আইউব হানাফী না করতেন---তাহলে উক্ত উদ্ধৃতি আমি কখনই পেশ করতাম না।’’ (ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা--৮৬) আইয়ূব সাহেব আপনাকে ‘ওহাবী’ বলে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন বলে আপনি ইমাম আবু হানিফাকে শয়তান ও কুলক্ষণা সন্তান বলবেন এই বিচার কি হাদিসে পেয়েছেন ? নিজেদের আহ্লে হাদিস বলে হাদিসের মর্যাদাকে কলঙ্কিত করবেন না। আর আইউব হোসেন আপনাকে ওহাবী বলে দোষ করল বলে আপনি ইমাম আবু হানিফাকে গালিগালাজ করে প্রতিশোধ নেবেন এই অধিকার আপনি কোন হাদিসে পেয়েছেন ? একজন অপরাধ করলে অন্যজনকে গালিগালাজকারীর নামই কি আহ্লে হাদিস ? বিচার দিবসে আল্লাহর দরবারে কি করে মুখ দেখাবেন ?

সুতরাং এখানে বর্ধমানী সাহেব শাক দিয়ে মাছ ঢাকার জঘন্য প্রয়াস করেছেন, তা পরিষ্কার অনুনেয়।

হক্ক কো না তসলিম হরগিজ কারেঙ্গে,
আজল সে কসম খা কে আয়ে হুয়ে হ্যাঁয়
না কুরআঁ কো মানে না ফরমানে নববী
ইয়ে ‘নজদী’ মেরে আজমায়ে হুয়ে হ্যাঁয়।।

হানাফীদের মরজিয়া অপবাদ ও তার খণ্ডন

আহলে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদ্দীন সম্প্রদায়ের লোকেরা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কে এবং হানাফীদেরকে মরজিয়া বলে অভিহিত করে। আর তারা মানুষকে সব থেকে বড় বোকা বানায় হযরত বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর 'গুনিয়াতুত ত্বালেবীন' কেতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে। যেমন আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব তাঁর পুস্তকে সাধারণ মুসলমানকে বোকা বানানোর জন্য লিখেছেন, "এজন্যই সৈয়দ মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী তাঁর গুনিয়াতুত তালেবীনে ইমাম আবু হানিফাকে ও হানাফীদের মুর্জিয়া বলে অভিহিত করেছেন। এবং বাহাত্তর ফিরকার মধ্যে একটি ফিরকা বলে উল্লেখ করেছেন।" (কাট হুজ্জতির জওয়াব, পৃষ্ঠা-৮৫)

অথচ বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) কখনোই ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কে এবং হানাফীদেরকে মরজিয়া দলভুক্ত করেন নি। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) তাঁর গুনিয়াতুত ত্বালবীন কিতাবে পরিস্কার ভাষায় লিখেছেন, ঐ পথভ্রষ্ট দলগুলি তাবেয়ীনদের বহু পরে জন্মগ্রহণ করেছে।

(গুনিয়াতুত ত্বালেবীন, পৃষ্ঠা--১২৩, মল্লিক ব্রাদার্স ছাপা, নভেম্বর ২০০০, বঙ্গানুবাদ-মনিরুনি খান)

আর যেহেতু ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) একজন বিশিষ্ঠ তাবেয়ীন ছিলেন তাই বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এবং হানাফীরা মরজিয়া দলভুক্ত নন। আর কোন আহ্‌লে হাদিস দলের হালালী (?) সন্তান যদি 'গুনিয়াতুত্তালেবিন' কিতাবের কোথাও দেখাতে পারেন যে, বড় পীর

আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) ইমাম আবু হানিফা ও হানাফীদের মরজিয়া বলে অভিহিত করেছেন, তাহলে আমার তরফ থেকে দশ লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার দানের ওয়াদা রইল।

আসল কথা হল, মরজিয়ারা বারটি উপদলে বিভক্ত। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) তাদের দলের বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "মুরজিয়াহ দলের বারটি উপদল আছে। যথা জাহমিয়াহ, সালিয়াহ, শামরিয়া, ইউনুসিয়াহ, ইউনানিয়াহ, নাজ্জারিহ, গীলানীয়াহ, শাবীওয়াহ, **হানাফিয়াহ**, মুআজিয়াহ, মারাসিয়াহ ও কারামিয়াহ।" (গুনিয়াতুত ত্বালেবীন, পৃষ্ঠা--১২৯)

সুতরাং এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মরজিয়াদের বারটি উপদলের মধ্যে একটি দল নিজেদেরকে 'হানাফিয়া' বলত তাদেরকে বড় পীড় আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) বাহাত্তর ফিরকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রচলিত হানাফীদেরকে এবং ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কে মরজিয়া দলভুক্ত করেন নি। বরং মরজিয়া ফেরকার একটা দল নিজেদেরকে প্রসিদ্ধ করার জন্য নিজেদেরকে হানাফী বলত। যেমন ভারতবর্ষে দেওবন্দী পন্থী ছাড়া বহু বিদআতী দল আছে যারা নিজেদেরকে হানাফী বলে থাকে, আর দেওবন্দীরা ওদের বিদআতী ফেরকা বলে থাকে কেননা তারা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর নীতি থেকে অনেক দূরে। ঠিক সেই রকম মরজিয়াদের একটি দল নিজেদের হানাফী বলে, অথচ তারা ইমাম আবু হানিফা(রহঃ) এর নীতি থেকে অতি দূরে। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর মজহাবের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। কেবলমাত্র হানাফিদের কয়েকটি মশলা মাসায়েলের উপর আমল করে মাত্র।

বড় বীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) মরজিয়াদের আকিদা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, “মুরজিয়াদের বিশ্বাস ইমান মুখে বলাই যথেষ্ট। অর্থাৎ কেউ যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ মুখে বলে তবে সে যত বড় গুনাহকারীই হোক না না কেন, কখনো দোজখে যাবে না। তারা মনে করে, ঈমান কম-বেশী হয় না। সুতরাং তাদের মতে সাধারণ মানুষের ঈমান নবী রাসুলদের ঈমানের সমান। এর মধ্যে কোন কম-বেশী নেই।” (গুনিয়াতুত ত্বালেবীন, পৃষ্ঠা--১২৯)

অথচ দেখতে পাওয়া যায় হানাফীরা মরজিয়াদের মত কখনোই এরকম জঘন্য আকিদা পোষণ করেন না। তাঁরা কখনওই বলেন না, ঈমান মুখে বলাই যথেষ্ট। যদি তাই হতে তাহলে ইমামে আযম আবু হানিফা (রহঃ) চল্লিশ বছর ধরে এশার ওজু দ্বারা ফজরের নামাজ পড়তেন না। যদি ইমান মুখে বলাই যথেষ্ট হত তাহলে এত কষ্ট করতেন না। আর আমাদের হানাফী আহলে সুন্নতুল জামাআতের লোকেরা কখনওই বলে না, সাধারণ মানুষের ঈমান নবী রাসুলদের ঈমানের সমান। একথা কোন হানাফী ফিকাহ গ্রন্থে লেখা নেই। মাওলানা আব্দুল হাই তাঁর কিতাব আর ***‘রফও ওয়াত তাকমিল ফিল জরহে ওয়াত তাদিল’*** নামক গ্রন্থে অকাট্য ভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে হানাফীরা মরজিয়া দলভুক্ত নন।

দেখা যায়, কেবলমাত্র ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কেই নয় বহু মোহাদ্দিসকেও ম রজিয়া দলভুক্ত বলে আনকে উল্লেখ করেছেন। যেমন, মোহাদ্দিস ইবনে কুতাইবা কর্ত্তৃক তাঁর বিখ্যাত কিতাবও বিশ্বাসযোগ্য ‘কিতাবুল মা আরেফ’ গ্রন্থে যেসব লোককে মরজিয়া বলে লোক সমাজে প্রচার করা হয়েছিল, তন্মধ্যে যেসব মোহাদ্দিস ও ফিকাহবিদ লোক ছিলেন নিম্নে তাঁদের কয়েকজনের নাম দেওয়া হল। যথা-ইব্রাহিম

তাইমী, তালাকুল হাবীব, হাম্মদ বিন সুলাইমান আব্দুল আজিজ বিন দাউদ, খারেজা বিন মায়সাব, আবু মবীতুবীর, এয়াহইয়া বিন জাকারিয়া ও মাসআর বিন কেরাম। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই হাদিস ও রেওয়ায়েতর ইমাম ছিলেন। সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফে তাঁদের অসংখ্য রেওয়ায়েত মজুদ রয়েছে। মোহাদ্দিস জাহবী লিখছেন, বহু খ্যাতনামা আলেমকেও অনেকে মরজিয়াভূক্ত করেছেন। অথচ তাঁদের উপর বিন্দু পরিমাণ দোষারোপ করার কারও অধিকার নেই। (চার ইমামের জীবনী, লেখক- লুৎফুর রহমান পৃষ্ঠা-৮৬)

একদিকে জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও হানাফীদের মরজিয়া বলতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করেন নি। আমরা একথা বুঝতে পারছি না যে জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব হঠাৎ রাতারাতি পীরভক্ত হয়ে গেলেন কেন ? বর্দ্ধমানী সাহেব তার 'পীরতন্ত্রের আজবলীলা' পুস্তকে পৃথিবীর সমস্ত পীর দিগকে ভণ্ড ও দাগাবাজ বলে উল্লেখ করেছেন। পীরদের সমস্ত তরীকাগুলো তিনি ভণ্ডামী বলে উল্লেখ করেছেন অথচ বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) কাদেরিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, একদিকে জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব পরোক্ষভাবে আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) কে ভণ্ড ও তাঁর তরীকাকে ভণ্ডামী বলেছেন। অপরদিকে সেই ভণ্ড তরিকার বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর 'গুনিয়াতুত ত্বালেবীন' কিতাবের এবারতকে কাটছাট করে পেশ করে আবু হানিফা (রহঃ) ও হানাফীদেরকে মরজিয়া বলছেন, এটা কি তাঁর দুমুখো চুগলখোরী নীতি ও ভণ্ডামী নয় কি ?

আমরা জানি আবু তাহের বর্দ্ধমানী ও তাঁর আহলে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদ্দীন সম্প্রদায়ের লোকেরা চার ইমাম ও তাঁদের মজহাবকে মানা শির্ক বলে মনে করে, অথচ বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) হাম্বলী মজহাবের লোক ছিলেন এবং তিনি 'গুনিয়াতুত ত্বালেবীন' কেতাবে লিখেছেন, ''আহলে সুন্নত আল জামাআতের সকলেই একমত যে ইমামগণ (চার ইমাম-ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল) ও তাঁদের অনুসারীদের নির্দেশ পালন করা সব মুসলমানের জন্য ওয়াজীব।'' (গুনিয়াতুত ত্বালেবীন, পৃষ্ঠা-১২১)

বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) তাঁর কিতাবে মজহাব অমান্যকারীদেরকে খারিজী বলে উল্লেখ করেছেন বাতিল ফিরকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন (ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা-১২৬)

অপরদিকে আমরা আরও দেখতে পাই, জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব ও তাঁর দলবলের আহলে হাদিস দলের লোকেরা বলে আল্লাহর আকার আছে। যেমন গায়ের মুকাল্লিদীন মৌলবী মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম সাহেব লিখেছেন, ''আল্লাহর আকার আছে কিন্তু কোন সৃষ্টির সাথে তাঁর তুলনা করা যাবে না। (মাযহাবীদের গুপ্তধন, পৃষ্ঠা-৩৫)

আর বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) বলেছেন, ''কুরআনের আয়াত এবং অন্যসব দলীল অনুসারে স্রষ্টার পরিচয় জানতে হলে নীচের বিষয়গুলির উপর বিশ্বাস রাখা প্রয়োজন, যেমন---আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। **তাঁর কোন আকার বা আয়তন নেই**।'' (গুনিয়াতুত ত্বালেবীন, পৃষ্ঠা--৯০)

বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী(রহঃ) তাঁর ‘গুনিয়াতুত ত্বালেবীন’ কিতাবে আল্লাহর আকার আছে এই মতবাদ এরকম বিশ্বাসীদেরকে খারেজী দলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তাদেরকে বাতিল ফিরকা বলে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি তাদেরকে তাদেরকে জাহান্নামী দল বলে বর্ণনা করেছেন।

আমরা আরও দেখতে পাই জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব ও তাঁর দলের লোকের ইজমায়ে উম্মাতকে মানে না। কিন্তু বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) যারা ইজমায়ে উম্মাতকে মানে না তাদেরকে মুতাজিলা বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাদেরকে বাহাত্তর ফিরকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বড় পীর সাহেব লিখেছেন, “মোতাজিলা ফিরকার একটা দলের নাম নেজামিয়া। এরা মিঞা নিজামকে মেনে চলে। এরা এজমায়ে উম্মতকে মানে না। এরা বলে, এজমা বাতিলের উপরও হতে পারে।” (গুনিয়াতুত ত্বালেবীন, পৃঃ ২০৬)

সুতরাং এখানে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর ফতোয়া অনুযায়ী সমস্ত আহলে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদিন সম্প্রদায়ের লোকেরা মুতাজিলা নামক বাতিল ফিরকার অন্তর্ভুক্ত।

আমরা আরও জানি, আহলে হাদিস দলের লোকেরা তিন তালাককে এক তালাক বলে গণ্য করে। অথচ বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) হাম্বলী মজহাবের লোক ছিলেন, আর হাম্বলী মজহাবে তিন তালাককে তিন তালাক বলেই গণ্য করা হয়।

আমরা আরও জানি আহলে হাদিস দলের লোকেরা আট রাকাআত তারাবীহর নামাজ পড়ে এবং কুড়ি রাকাআত তারাবিহ নামাজকে জইফ (দুর্বল) ও মওজু (মনগড়া) বলে। অথচ বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) তাঁর ‘গুনিয়াতুত ত্বালেবীন’ কিতাবে তারাবীহর নামাজকে আট রাকাআত নয় কুড়ি রাকাআত বলে গণ্য করেছেন।

এরকম আরও অনেক বিষয় আছে যেখানে আহলে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদিন ও বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর মধ্যে আকাশ পাতাল ফারাক। এ সমস্ত কথা লিখতে গেলে এই পুস্তকের কলেবর বিরাট আকার ধারণ করবে তাই আপাততঃ ক্ষান্ত হলাম।

কিন্তু ভাবলে অবাক লাগে জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব জীবনে কোনদিন বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর গুনিয়াতুত ত্বালেবীন কিতাবখানি পুরো পড়ে দেখেছেন কিনা সন্দেহ। যদি পড়ে দেখতেন তাহলে কোনদিন তিনি গুনিয়াতুত ত্বালেবীন কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম আবু হানিফা ও হানাফীদেরকে মরজিয়া বলে অভিহিত করতেন না। এবং ইমাম আবু হানিফা ও হানাফীদের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করার জঘন্য প্রয়াসও করতেন না।

আর আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব যে কাট হুজ্জতির জওয়াব লিখতে গিয়ে যে এঁড়ে হুজ্জতির উপস্থাপন করেছেন তা প্রত্যেক পাঠক মাত্রই বুঝতে পারছেন। আর জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব যে বড়পীর সাহেবের ‘গুনিয়াতুত ত্বালেবীন’ কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে আবু হানিফা ও হানাফীদেরকে মরজিয়া বলে অভিহিত করার প্রয়াস করেছেন

সেটা কোন আবু হানিফা ? হানাফী মজহাবের ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সবেত ? না যে উনিশজন আবু হানিফার নাম জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করেছেন সেই আবু হানিফা। সুতরাং আমরা বুঝব কি করে কোন আবু হানিফার কথা এখানে বলা হয়েছে ? একটু বুঝিয়ে বলবেন কি ?

তাকলিদ করা কি শিরক্ ?

আহলে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদীন সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে তাকলিদ করা শিরক। প্রথমে আমাদের জানা উচিৎ তাকলিদ কাকে বলে ?

তাকলিদ বলা হয় কোন ধর্ম বিষারদ ফিকাহ শাস্ত্রবিদ মুজতাহিদ কোরআন হাদিসের চরম জ্ঞানী ও পারদর্শী ব্যক্তির উপর আস্থা রেখে তার অনুস্মরণ করা অর্থাৎ শরীয়াতের উপর পরিপূর্ণ বিচক্ষণ জ্ঞান অর্জনকারী উলামার পথ প্রদর্শন বা পরিচালনায় শরীয়াতের উপর আমল করা।

সমস্ত মুসলমানদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাঃ) এর অনুসরণ করা ফরজ। একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয় যে সে আল্লাহর কালামে বর্ণিত সবকিছু হুকুম আহ্কাম সঠিকভাবে নিজেই বুঝে নেবে এবং তার অন্তর্নিহিত রহস্য নিজেই বুঝে তার উপর আমল করবে। আর এটাও সম্ভব নয় যে কোন সাধারণ মানুষ রসুলে (করীম (সাঃ) এর ২৩ বছরের সমস্ত কথা ও কর্মের পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখবে। সহীহ হাদিস ও মওজু হাদিসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে। কোন হাদিসটা সহীহ, কোন হাদিসটা মওজু, কোন হাদিসটা হাসান, কোন

হাদিসটা মুরসাল, কোন হাদিসটা মরফু, কোন হাদিসটা মৌকুফ, কোন হাদিসটা মক্কতু তার বিস্তারিত জ্ঞান রাখবে। সেজন্য ধর্মবিষারদ ফিকাহ শাস্ত্রবিদ মুজতাহিদ বা শরীয়াতের উপরচরম পারদর্শী যিনি আল্লাহর কোরআনের এবং হাদিস শরীফের সমস্ত অন্তর্নিহিত রহস্য বুঝতে পারেন তাঁর উপর ভরসা করে দলীল অনুসন্ধান না করে তাঁর কথা মোতাবেক কোরআন-হাদিসের উপর আমল করাকেই তাকলিদ বলা হয়।

তাকলিদ দুই প্রকার, যথা ঃ-- তাকলিদে শাখশী ও তাকলিদে গায়ের শাখশী। তাকলিদে শাখশী বলা হয় কোন নির্দিষ্ট মযহাবের তাকলিদ করা আর তাকলিদে গায়ের শাখশী বলা হয় অনির্দিষ্টভাবে যে কোন ইমাম বা মুজতাহিদদের অনুসরণ করা।

হুজুর (সাঃ) এর জমানায় মসআলার জ্ঞান অর্জন করার তিনপ্রকার পদ্ধতি ছিল। প্রথমত, রাসুসুল্লাহ (সাঃ) এর কাছ থেকে সরাসরি মসআলার জ্ঞান অর্জন করা। দ্বিতীয়ত, ইজতেহাদ এবং তৃতীয়ত তাকলিদ। যাঁরা হুজুর (সাঃ) এর সংস্পর্শে থাকতেন তাঁরা হুজুর (সাঃ) এর কাছ থেকে মসআলা জেনে নিতেন। কিন্তু যে সমস্ত লোকেরা হুজুর (সাঃ) এর সাক্ষাত লাভ করতে বা তার থেকে সরাসরি শিক্ষা অর্জন করতে সক্ষম হতেন না তাঁরা যদি ইজতেহাদ করার ক্ষমতা রাখতেন তাহলে তাঁরা ইজতেহাদ করে মসআলা. ইস্তেম্বাত করে নিতেন। এবং যাঁরা ইজতেহাদ করার ক্ষমতা রাখতেন না বা যাঁরা ইজতেহাদ করতে চায়তেন না তাঁরা কোন বিচক্ষণ ধর্মবিষারদ মুজতাহিদের কাছে গিয়ে মশলা জেনে নিয়ে আমল করতেন।

হুজুর (সাঃ) এর এন্তেকালের পর দ্বীন অর্জন করার দুটি পদ্ধতি বাকি রইল। এক নম্বরে ইজতেহাদ ও দুই নম্বরে তাকলিদ। আল্লাহ পাকের অসীম রহমতে এই

উম্মতে মুসলিমদের মধ্যে অসংখ্য মুজতাহিদ জন্মগ্রহণ করেছেন। শুরু শুরুতে কোন মুজতাহিদের উসুল ও কায়েদা সংগৃহীত ও একত্রিত করা হয়নি সেজন্য কোন নির্দিষ্ট মুজতাহিদের সমস্ত ইস্তেম্বাতকৃত মসআলা-মাসায়েল গুলির জানা সম্ভব ছিল না। সেজন্য সেই সময়কার লোকেরা সামনে যে মুজতাহিদকে পেয়ে যেতেন তাঁর কাছে প্রয়োজনমত মসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করে তাকলীদ বা অনুস্মরণ করতেন। কোন নির্দিষ্ট মুজতাহিদের পাবন্দি ছিলেন না।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন, "সেজন্য লোকেরা সাহাবায়ে কেরামদের যুগে চার মযহাব প্রকাশ পাওয়ার আগে পর্যন্ত যে কোন কোর আন হাদিস বিশেষজ্ঞদের তাকলিদ করে নিতেন। এটিকে কোন লোক (আলেম) অস্বীকার করেন নি। যদি এটা (তাকলীদ করা) ভুল হত তাহলে নিশ্চয় লোকেরা এটাকে অস্বীকার করতেন (আলেমরা তার প্রতিবাদ করতেন)।" (একদুল জিদ, পৃঃ ৩৩)

শাহওয়ালী উল্লাহ মুহাসি দেহলবী (রহঃ) আরও লিখেছেন, "দ্বিতীয় শতকের পরে জনগণের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট মুজতাহিদের মজহাবের উপর চলার রেওয়াজ আর হল। কোন অনির্দিষ্ট মজহাবের উপর আমলাকারীর সংখ্যা কমে গেল এবং সেই যুগে সেটাই ওয়াজীব ছিল।" (আল ইনসাফ ফি বায়ানিল ইখতেলাফ, পৃঃ ৫৯)

হিজরীর চতুর্থ শতকে চার মজহাব (অর্থাৎ হানাফী, হাম্বলী, শাফেয়ী ও মালেকী) এই চার মজহাবের গ্রন্থ যখন লিপিবদ্ধ হল এবং সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল এবং এই চার মজহাবের উপর আমল করা সহজবোধ্য হয়ে গেল এবং এর চার ম

জহাবের চার ইমাম ছাড়াও বাকি যেসব মুজতাহিদীনদের মজহাব ছিল তাদের প্রভাব চতুর্থ হিজরীর কাছাকাছি কোথাও না কোথাও পাওয়া যেত তা আস্তে আস্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এমনকি এই চার ইমামের চার মজহাব ছাড়া হকপন্থীদের কোন মজহাব আর বাকী রইল না।

সার কথা হিজরীর চতুর্থ শতকের পরে সমস্ত মুজতাহিদীনদের মজহাব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল এবং সমগ্র পৃথিবীতে হকপন্থীদের মধ্যে কেবলমাত্র চার ইমামের মুকাল্লিদীনরাই বাকি রয়ে গেলেন। এখন আমাদের কাছে দুটি অবস্থায় বাকি রইল, হয় জনগণ নিজের সিদ্ধান্ত ও খেয়ালকে যথেষ্ট মনে করে দ্বীন ইসলামকে খেল তামাশা বানিয়ে নিবেন এবং না হয় চার মযহাবের কোন একটা মযহাবের তাকলিদ করে নিজের দ্বীন ইসলামকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিবেন। কেননা আল্লাহ তা আলা নবী কারীম (সাঃ) এর উম্মতকে কিয়ামত পর্যন্ত গুমরাহীর হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছেন, সেজন্য আল্লাহ তাআলা গায়েব থেকে এমন নিয়ামত দান করেছেন যে স্বতস্ফূর্তভাবে মানুষের হৃদয়ে চার ইমামের তাকলিদে শাখশীর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে গেল এবং তাঁর দ্বীনের মধ্যে মতভেদী ও বিভ্রান্তির শিকার হতে বেঁচে গেল। লোকেরা নিশ্চিন্তে চার মযহাবের উপর আমল করতে লাগল।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন, ‘‘আয়েম্মায়ে আরবায়া (চার ইমাম) মজহাবকে গ্রহণ করে নেওয়ার মধ্যে একটা রহস্য আছে যে রহস্য আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের উলামার অন্তরে গেঁথে দিয়ে এর উপর একত্রিত (ইজমা) করে দিয়েছেন। কোন ব্যক্তি এই রহস্যকে বুঝতে সক্ষম হোক বা না হোক।’’ (আল ইনসাফ)

চতুর্থ হিজরীর পর যত বড় বড় মুহাদ্দিসীনে এজাম বিগত হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকে এই চার মজহাবের কোন না কোন মজহাবের মুকাল্লিদ ছিলেন।

এখানে দেখা যাচ্ছে, হিজরীর দ্বিতীয় শতকে তাকলিদে গায়ের শাখশীর রেওয়াজ ছিল, হিজরীর দ্বিতীয় শতকের পরে তৃতীয় শতক পর্যন্ত তাকলিদে গায়ের শাখশী কম এবং তাকলিদে শাখশীর রেওয়াজ বেশী শুরু হয়েছিল, এরপর হিজরীর চতুর্থ শতকে তাকলিদে শাখশী গ্রহণ করা নিয়ে মুহাদ্দিসীনে কেরামদের ইজমা হয়ে গিয়েছিল।

সুতরাং তাকলিদে শাখশী গ্রহণ করা হল ইজমায়ে উম্মত। এখানে যদি কোন আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে, আমরা সরাসরি আল্লাহর কুরআন ও রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদিস মানি ইজমায়ে উম্মত-টুম্মত মানি না। তাহলে কোন হাদিসের সনদ সহীহ কিনা যাঁচাই করা সেটাও মুহাদ্দিসীনে কেরামদের ইজমা অর্থাৎ এটাও তো ইজমায়ে উম্মত। ইজমায়ে উম্মত না মানলে সমস্ত সহীহ হাদিসগুলোও ত হাওয়ায় উড়ে যাবে। হাদিস সহীহ হওয়ার জন্য যদি ইজমায়ে উম্মত মানা হয়, তাহলে মজহাব গ্রহণ করার জন্য ইজমায়ে উম্মত মানা যাবে না কেন ? এটা আহলে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদীনদের দুমুখো চুগলখোরী নীতি নয় ত আর কি ?

মুজতাহিদিনদের তাকলিদ করা কোরআন শরীফ দ্বারাও প্রমাণিত। মহান আল্লাহপাক কোরআন শরীফে বর্ণনা করেছেন, "ফাসআলু আহলাল যিক্‌র্ ইনকুনতুম লা তাআলামুন।" অর্থাৎ যদি তোমরা (কোন বিষয়ে) না জান তাহলে কুরআন বিশেষজ্ঞদের নিকট জেনে নাও।

রুহুল মাআনী এই আয়াতের তাফসিরে লিখেছেন, "এই আয়াতের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়, যে ব্যাপারে নিজের কোন জ্ঞান নেই সেই ব্যাপারে উলামাদের নিকট জেনে নেওয়া ওয়াজীব।" (তফসিরে রুহুল মাআনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৪৮)

হাফিজ আব্দুল বার (রহঃ) লিখেছেন, "উলামায়ে কেরামগণ এই ব্যাপারে একমত যে, সাধারণ মানুষের জন্য নিজেদের উলামাদের তাকলিদ করা ওয়াজীব। এবং আল্লাহর বানী 'ফাসআলু আহলাল যিকর্' বলতে এইসব লোকদেরকে বলা হয়েছে। (জামে বায়ানুল ইলম ও ফয়সালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৮৯)

কোরআন শরীফে মহান আল্লাহপাক আরও বলেছেন, "ইয়া আই ইউহাল্লাযিনা আমানু আতিউল্লাহ ও আতিউর রাসুল ওয়া উলিল আমর মিনুকম" অর্থাৎ হে ইমানদারগন! তোমরা আল্লাহকে মানো এবং তাঁর রাসুলকে মানো এবং তোমাদের মধ্যে যারা 'ওয়া উলিল আমর' অর্থাৎ 'উলামা-ফুকাহাদেরকে মানো।"

মুফাসসিরিনে কেরামরা বলেছেন "ওয়া উলিল আমর' বলতে মুজতাহিদিনদেরকে বোঝায় যাঁরা ইজতেহাদের মাধ্যমে কোরান হাদিস থেকে মাশলা মাশায়েল ইস্তেম্বাত করতে পারেন।

সুতরাং এই আয়াতের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে শরীয়াতে 'ওয়া উলিল আমর' অর্থাৎ মুজতাহিদিনদের অনুসরণ বা তাকলিদ করা ওয়াজীব। এবং তাকলিদ তারা করবে যারা ইজতেহাদের পর্যায়ে পৌঁছায়নি।

সুতরাং এখানে কোরআন শরীফ থেকে পরিষ্কার প্রমাণ হয়ে গেল যারা মুজতাহিদ তাঁদের তাকলিদ করা ওয়াজীব এবং মুজতাহিদিনদের তাকলিদ তরক করে দেওয়া হারাম। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন; রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের মধ্যে খুতবা দিলেন (এবং খুতবার মধ্যে বললেন) আমার পরে তোমরা অনেক মতভেদ দেখবে তখন আমার সুন্নত এবং আমার পথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নতের উপর টিকে থাকবে।" (ইবনে মাজা, পৃঃ ৫)

এই হাদিসের দ্বারা উলামায়ে কেরামগণ খুলাফায়ে রাশেদীনদের মধ্যে আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীনদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হযরত শাহ আব্দুল গনি (রহঃ) ইবনে মাজার হাশিয়ায় লিখেছেন, "যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর তরিকার উপর চলবে, যেমন চারজন আয়েম্মা এবং শরীয়াতী হাকিম যেমন উমর বিন আব্দুল আজীজ এই হাদিসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।" (আনজাহাল হাজিয়া আলা ইবনে মাজা, পৃঃ ৫)

হাফেজুল হাদিসে আল্লামা জালালুদ্দিন সূয়তী (রহঃ) লিখেছেন, "সাধারণ লোক এবং যাঁরা ইজতেহাদের দরজায় পৌঁছায়নি তাঁদের জন্য মুজতাহিদিনদের (চার ইমাম) মজহাবের মধ্যে কোন একটা মজহাব অবলম্বন করা ওয়াজীব।" (শারাহ্ জামাউল জাওয়ামী', পৃঃ ১৭৫)

এখানে গায়ের মুকাল্লিদীন সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে, চার ইমাম ছাড়া আরও আজকে মুজতাহীনদিন রয়েছেন তাঁদের কেন তাকলিদ করা যাবে না। উত্তরে বলব, তাদের বিস্তারিত মতামত আমাদের নিকট পৌঁছায়নি। তাই আল্লামা ইবনে সালেহ (রহঃ) বলেছেন, ‘‘চার আয়েম্মা ছাড়া আর অন্য কারো তাকলিদ করা নিষিদ্ধ।’’

আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী (রহঃ) ‘ফাতহুল মুবিন ফি শারাহু আরাবাঈন’ এর মধ্যে বলেছেন, ‘‘অর্থাৎ আমাদের আয়েম্মারা বলেছেন যে, আমাদের যুগে আয়েম্মায়ে আরবা’ অর্থাৎ শাফেয়ী, মালেকী, আবু হানিফা এবং আহমদ ইবনে হাম্বল ছাড়া অন্য কারো তাকলিদ করা জায়েজ নয়।’’ (তথ্যসূত্র ঃ আউসাহতাল জিদ, পৃঃ ১৯)

আল্লামা তাহ্‌তাবী (রহঃ) হাসিয়া ‘দুর্রুল মুখতারের’ মধ্যে বলেছেন, ‘‘যে ব্যক্তি আমাদের যুগে এই চার মজহাব (শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল) থেকে খারিজ থাকবে তারা বিদআতী এবং জাহান্নামী। (ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ১৯)

সুতরাং এখানে ইবনে হাজার মক্কী (রহঃ) এর ফতোয়া অনুযায়ী যারা তাকলিদ করে না অর্থাৎ গায়ের মুকাল্লিদিন আহলে হাদিস সম্প্রদায় বিদআতী ও জাহান্নামী। এখন যদি কোন গায়ের মুকাল্লিদ আহলে হাদিস দলের লোকেরা আমাকে গালিগালাজ করে। তাহলে আমি বলব, গালিগালাজ যদি করতেই হয় তাহলে ইবনে হাজার মক্কী (রহঃ)কে গালিগালাজ করুন। দয়া করে আমাদেরকে গালিগালাজ করবেন না।

সুরা ফাতেহা থেকে তাকলিদের প্রমাণ

ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়াকে আহলে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদিন সম্প্রদায় ফরজ বলে মনে করে। সেই সুরা ফাতেহাতেই রয়েছে মসলায়ে তাকলিদের প্রমাণ।

সুরা ফাতেহার দুটি অংশ। প্রথম অংশ মহান আল্লাহ পাক 'আল হামদুলিল্লাহি...' থেকে শুরু করে 'নাসতায়ীন' পর্যন্ত তৌহিদের বর্ণনা করেছেন এবং দ্বিতীয় অংশে ম হান আল্লাহ পাক 'ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম' থেকে শুরু করে 'ওয়ালাদ্ব্ দ্ব--ল্লীন' পর্যন্ত তাকলিদের বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে সুরা ফাতেহায় বলেছেন, "ইহদিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম সিরা ত্বাল্লাযী-না আন্ আমতা আ'লাইহিম্ গাইরিল্ মাগদ্বূ-বি আলাইহিম্।" (সুরা ফাতেহা, আয়াত- ৫-৭)

অর্থাৎ আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। ঐ লোকদের পথ--যাদের আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে।

সুতরাং এখানে মহান আল্লাহ পাক সেই লোকদের পথে চলতে বলেছেন যে পথে তিনি অনুগ্রহ করেছেন। আর আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করেছেন নবীদের পথে, সাহাবায়ে কেরামদের পথে, আউলিয়া আল্লাহদের পথে, আয়েম্মায়ে মুজতাহিদিনদের পথে, মুহাদ্দিসিনে কেরামদের পথে।

আর ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় চারজন ইমাম পৃথিবীতে আসার পর সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরাম, আয়েম্মায়ে মুজতাহিদ্দিন, সমস্ত মুহাদ্দিসীন কেরামরা এই চার ইমামের মধ্যে কারো না কারো তাকলিদ করে গেছেন এবং এই চার ইমামের মধ্যে একজন ইমামের তাকলিদ করাকে ওয়াজীব বলেছেন।

সুতরাং কোরআন শরীফের হুকুম অনুযায়ী এই চারজন ইমামের (ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম শাফেয়ী) মধ্যে যে কোন একজনের তাকলিদ করা ওয়াজীব।

না বুঝে সরাসরি হাদিসের উপর আমল করা গুমরাহী

না বুঝে সরাসরি হাদিসের উপর আমল করা যে গুমরাহী তা বিদগ্ধ উলমায়ে কেরামরা ফতোয়া দিয়েছেন। গায়ের মুকাল্লিদ্দিন আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে, সহীহ হাদিস পেলেই সেটা আমল করার যোগ্য। কিন্তু উলামায়ে কেরামরা না বুঝে সরাসরি কুরআন হাদিশের উপর আমল করা গুমরাহী বলে বর্ণনা করেছেন। যে সব বিদগ্ধ উলমায়ে কেরামরা না বুঝে সরাসরি হাদিসের উপর আমল করাকে গুমরাহী বলেছেন তা নিচে বর্ণনা করা হল।

১) কাযী আবু ইউসুফ (রহঃ) যিনি ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ছিলেন তিনি বলেছেন, “সাধারণ মানুষ যখন কোন হাদিস শুনবে তার জন্য জায়েজ নয় যে বাইরে যা বুঝে তার উপর আমল করবে। কেননা, হাদিস থেকে সে যা মানে বুঝেছে সেটা মনসুখও হতে পারে।” (কেফায়া)

২) ফকীহ মুহাম্মদ বিন ইসা আলতাবা (রহঃ) বলেছেন, “রসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে যেসব হাদিস বর্ণনা করা হয় যে হাদিস সম্পর্কে তোমরা জান না যে এই হাদিসের উপর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাহাবীর আমল করেছেন কিনা (যদি না থাকে)তাহলে সেই হাদিসকে তোমরা ছেড়ে দেবে।” (আল ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কীহ)

সুতরাং উপরিউক্ত বুযর্গানে দ্বীনদের ফতোয়া অনুযায়ী পরিস্কার প্রমাণ হল যে, না বুঝে সরাসরি হাদিসের উপর আমল করা গুমরাহী, কেননা হাদিসের অনেক প্রকারভেদ আছে ও তার বিভিন্ন বিধান আছে ও হাদিশের সঠিক অর্থ সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা বড় বড় উলামায়ে কেরামদেরও পক্ষে বোঝা কষ্টকর, ইমাম মুজতাহিদরাই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহনে পারদর্শী। তাদের ব্যাখ্যা অনুসারে আমাদের চলা কর্তব্য।

কেবলমাত্র একজন ইমামের তাকলিদ কেন ?

গায়ের মুকাল্লিদীন আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে, চারজন ইমামই যদি বরহক (সত্য) হন তাহলে একজন ইমামের তাকলিদ কেন করা হয় ? কোন মাস আলায় ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)এর কোন মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর কোন মাসআলায় ইমাম মালেক (রহঃ)এর এবং কোন মাসআলায় ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল (রহঃ)এর তাকলিদ কেন করা হয় না ?

উত্তরে একথায় বলব যে, চার ইমামের মধ্যে বিভিন্ন মাসআলায় মতভেদ আছে। এই মতভেদী মাসআলায় সাধারণ মানুষ নিজের সামান্য জ্ঞানের ভিত্তিতে টানা-হিঁচড়া করতে গিয়ে দেখা যাবে, সব ইমামের নিকট তিনি ভুল করে বসেছেন, অর্থাৎ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি পথভ্রষ্ট হয়েছেন। আর সব থেকে বড় কথা হল, সাধারন মানুষ মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে সুযোগ পেয়ে যাবে এবং নিজেদের নফসের এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে শুরু করে দেবে। যেমন যদি কোন লোকের সোনাদানা থাকে তাহলে তারজন্য জাকাত দেওয়া ফরজ তখন হানাফী মজহাবের লোক জাকাত থেকে বাঁচবার জন্য বলবে জাকাত দেব না, কেননা শাফেয়ী মজহাবে ব্যবহৃত সোনার জাকাত দেওয়া ফরজ নয়, ঠিক সেই রকম, শীতকালে যদি কারো শরীর থেকে রক্ত বেরিয়ে যায় তাহলে সে ওজু না করার জন্য বলবে, আমি ওজু করব না, কেননা শাফেয়ী মজহাবের নিয়ম অনুসারের শরীর থেকে রক্ত বেরিয়ে গেলে ওজু ভাঙে না। যদিও হানাফী মজহাবের নিয়ম অনুযায়ী শরীর থেকে রক্ত বেরিয়ে যায় এবং যদি গড়িয়ে যায় তাহলে ওজু ভেঙে যাবে। আর কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে স্পর্শ করে বলে আমি অজু করব না, কারণ, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতে অজু নষ্ট হয় না। এই রকম ভাবে মানুষ নিজের খাহেশাত ও ইচ্ছা অনুযায়ী আমল করতে শুরু করবে যা শরীয়াতে আদৌ জায়েজ নয়। এবং এর আর একটি ক্ষতি হল, সুযোগ সন্ধানী লোকেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজ নফ্স ও প্রবৃত্তির অনুসরন শুরু করে দেবে। এরকম করা হলে দেখা যাবে, এক এক করে চার ইমামের নিকট তার অজু ভঙ্গ হয়ে গেছে এবং তার নামাজই হল না, মুজতাহিদদের উপর ইজতিহাদ ফলাতে গিয়ে সব ইমামের নিকট আখেরাত খুইয়ে বসেছে। হ্যাঁ, কোন ব্যক্তি যদি এমন করে সব মাজহাবের সার্বজনীনতার দিকটি গ্রহন করে যেমন ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, রক্ত বের হলে অজু নষ্ট হয়, সেটি গ্রহন করল এবং ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)

বলেছেন, নারীকে স্পর্শ করলে অজু নষ্ট হয়, এটিকে গ্রহন করল, তাতে কোন অসুবিধা নেই।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন গ্রামে মনে করুন একটি নদী, একটি কুঁয়া, একটি পুকুর ও একটি চাঁপাকল আছে। মোট চারটি জলাশয়ের সুব্যবস্থা আছে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলে দিয়েছেন যে চারটি উৎসের জলই স্বচ্ছ এবং স্বাস্থ্য সম্মত। এখন কেউ যদি স্বাস্থ্য সম্মত মনে করে চারটি জলাশয় থেকে জল সরবরাহ করে এবং সেই জলে স্নান করে তাহলে তার শরীরে নানারকম রোগ দেখা দেবেই। ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার একথায় বলবেন, হয় নদীর জল সরবরাহ কর, না হয় কুঁয়ার জল সরবরাহ কর। না হয় পুকুরের জল সরবরাহ কর, না হয় চাঁপাকলের জল সরবরাহ কর, যে কোন একটি উৎসের জল সরবরাহ কর। একসঙ্গে সমস্ত জল সরবরাহ করলে কোনদিন শরীরের রোগ ভাল হবে না।

ঠিক সেই রকম শরীয়াতের ডাক্তার অর্থাৎ সমস্ত মুহাদ্দিস, মুফাসসীর, আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীন, আকাবিরে উম্মাত, প্রত্যেকে বলে দিয়েছেন কেবলাত্র যে কোন একটি মজহাবের তাকলিদ করতে হবে তা নাহলে সাধারণ মানুষ মশলার ব্যাপারে সন্দেহ প্রবণ হয়ে পড়বে এবং কোনটা ঠিক কোনটি ভুল বুঝতে না পেরে ইমানহারা হয়ে যাবে।

এখানে গায়ের মুকাল্লিদীন আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোকেরা অভিযোগ করে বলে, চার ইমামের মধ্যে যখন এত মতভেদ তখন চারজন ইমাম কিভাবে সঠিক হতে

পারেন ? কেননা মতভেদী মাস্আলাগুলো সব একসঙ্গে সঠিক হতে পারে না কোন না কোন মাসআলা ভুল অবশ্যই হবে।

উত্তরে একথায় বলব, মতভেদী মাসআলাগুলোর কেউ জানে না কোনটা একশ শতাংশ সত্য আর কোনটা একশ শতাংশ ভুল। এখানে মুহাদ্দিসীনে কেরামদের মধ্যেই মতভেদ রয়েছে। এই বিষয়ে জানা দরকার, মতভেদী মাসআলাগুলো দুই প্রকার। (১) বাহ্যিক দৃষ্টিতে হাদিশ পরস্পর বিরোধী। কারণ, হুজুর (সাঃ) জীবনে কয়েক পদ্ধতিতে আমল করেছেন, চার ইমাম আমাদের নিকট সাহাবা থেকে চার ধরনের আমল ধারাবাহিক ভাবে পৌঁছেছে। আমরা নিজ মতে অন্য কোন ব্যাখ্যা দিতে পারি না। (২) আর একটি প্রকার হল, কুরআন-হাদিশে হুকুম-আহকাম স্পষ্ট উল্লেখ নেই, কুরআন হাদিশ থেকে শরিয়ত সম্মত ভাবে কিয়াস করে বের করা হয়েছে। যদি সকলের মত এক হয়ে যায়, তাহলে সেটিই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ এটা উম্মতের ইজমা। আর যদি চার ইমামের কিয়াস পৃথক হয়, তবে এর বাইরে পঞ্চম পদ্ধতির আর কোন প্রয়োজন নেই, যদি সেই বিষয়ে কিয়ামত পর্যন্ত কিয়াস করতে থাকে, তাহলে অসংখ্য মতবাদের সৃষ্টি হবে, যার কোন প্রয়োজন নেই।

মতভেদী মাসআলাগুলো যেমন, ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া সম্পর্কিত হাদিসকে কোন কোন মুহাসি বলেছেন মনসুখ হয়ে গেছে আর কোন কোন মুহাদ্দিস বলেন মনসুখ হয়নি। রফে ইদাইন করা সম্পর্কিত যত হাদিস আছে সে সম্পর্কে কোন কোন মুহাসি বলেছেন মনসুখ হয়ে গেছে, কোন কোন মুহাদ্দিস বলেন মনসুখ হয়নি। এই রকম হাদিসের বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে বিভিন্ন মুহাদ্দিসদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ঠিক সেই রকম শরীয়াতী মাসআলা গুলো নিয়ে চার ইমামের মধ্যেও মতভেদ

রয়েছে। এখানে সাধারণ আলেম উলামা ও সাধারণ মানুষেরা জানেন না, কোনটা ম নসুখ হয়ে গেছে আর কোনটা মনসুখ হয়নি। তাই এখানে চার ইমামের মধ্যে ম তভেদের রহস্য হল এটাই যদি হানাফি মজহাবের কোন মাসআলা-মাসায়েল মনসুখ হয়ে থাকে তাহলে শাফেয়ী মজহাবের মাধ্যমে সেটা আমল হয়ে যায়, আর যদি মনসুখ না হয়ে থাকে তাহলে সেটা হানাফী মজহাবের মাধ্যমে আমল হয়ে যায়। ঠিক সেই রকম হাম্বলী মজহাবের কোন মাসআলা-মাসায়েল যদি মনসুখ হয়ে থাকে তাহলে সেটা মালেকী মজহাবের মাধ্যমে আমল হয়ে যায়, আর যদি মনসুখ না হয়ে থাকে তাহলে সেটা হাম্বলী মজহাবের মাধ্যমে আমল হয়ে যায়। এইভাবে চার মজহাবের মাধ্যমে রাসুল্লাহ (সাঃ) এর সমস্ত সুন্নতের পর আমল হয়ে যায়। অর্থাৎ রাসুল্লাহ (সাঃ) এর কোন সুন্নত এই মুসলিম উম্মাতের মধ্যে মৃত বা আমল বিহীন থাকেনি চার মজহাবের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সমস্ত সুন্নত জীবিত। এটাই হল চার মজহাবের মধ্যে ম তভেদের সব থেকে বড় রহস্য।

একটু লক্ষ করলে দেখা যায়, হানাফী মজহাবের অনুসারীরা যারা রফে ইদাইন করে না তারা হাম্বলী ও শাফেয়ী মজহাবের অনুসারীদের যাঁরা রফে ইদাইন করে তাদেরকে গালিগালাজ ও রফে ইদাইন সম্পর্কিত হাসিদগুলোকে অস্বীকারও করে না। আর হাম্বলী ও শাফেয়ী মজহাবের অনুসারীরা যারা রকে ইদাইন করে তারা হানাফী ম জহাবের লোকদের যারা রফে ইদাইন করে না তাদেরকে গালিগালাজ ও রফে ইদাইন না করা সম্পর্কিত হাদিসগুলো অস্বীকার করে না।

ঠিক সেই রকম হানাফী মজহাবের লোকেরা যারা ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ে না তারা হাম্বলী ও শাফেয়ী মজহাবের অনুসারীদের যারা ইমামের পিছনে সুরা

ফাতেহা পড়ে তাদেরকে গালিগালাজ করে না এবং ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া সম্পর্কিত হাদিসগুলোকে অস্বীকার করে না। আর হাম্বলী ও শাফেয়ী মজহাবের লোকেরা যারা ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ে তারা হানাফী মজহাবের লোকদেরকে গালিগালাজ করে না এবং ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়া সম্পর্কিত হাদিসগুলোকেও অস্বীকার করে না।

আর এদিকে আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোকেরা যারা ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ে এবং রাফে ইদাইন করে তারা ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়া ও রাফে ইদাইন না করা সম্পর্কিত হাদিসগুলোকে শুধুমাত্র অস্বীকারই করে না বরং সেগুলোকে জইফ এবং মওজু প্রমাণ করার জন্য রক্ত শুকিয়ে হাড় কালি হয়ে যায়। আর অস্বীকার ও অবিশ্বাস মানুষকে কুফরির দিকে নিয়ে যায়।

আহলে সুন্নত ও আহলে হাদিস কি এক ?

গায়ের মুকাল্লিদীন আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে, আহলে হাদিস ও আহলে সুন্নত এক। তাই তারা নিজেদেরকে আহলে সুন্নতুল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে। কিন্তু বাস্তবে তারা সম্পূর্ণ আহলে সুন্নতের বিপরীত। প্রকৃত পক্ষে আহলে হাদিস ও আহলে সুন্নত কোনদিনই এক নয়। আহলে হাদিস ও আহলে সুন্নতের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বোখারী শরীফ, মুসলীম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, ইবনে মজা শরীফ, বাইহাকী শরীফ, মিশকাত শরীফ প্রভৃতি হাদিস গ্রন্থে

যত হাদিস বর্ণিত আছে সব হাদিস সুন্নত নয়। যেমন, বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন। এটা হাদিস কিন্তু সুন্নত নয়। আগুনের তৈরী হওয়া জিনিস খেলে ওজু ভেঙে যায় এটা হাদিস কিন্তু সুন্নত নয়। হাদিস শরীফে এটাও বর্ণিত আছে যে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ওজু করার পর স্বীয় স্ত্রীকে চুম্বন করেছেন। এটা হাদিস কিন্তু সুন্নত নয়। আরও যেমন বুখারী শরীফে বর্নিত আছে, সাহাবারা মদ খেয়েছেন, এটা হাদিশ, কিন্তু সুন্নত নয়।

সুতরাং এক কথায় হাদিস ও সুন্নত কোনদিন এক নয়। তাই আহলে হাদিস ও আহলে সুন্নত এক নয়। হুজুর (সাঃ) সব সুন্নত মানতে বলেছেন কিন্তু সব হাদিস মানতে বলেন নি।

এখন যদি কোন আহলে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদীন সম্প্রদায়ের লোকেরা গায়ের জোরে গলাবাজী করে বলে আহলে হাদিস ও আহলে সুন্নত এক। তাহলে তারা উপরিউক্ত হাদিসগুলোকে সুন্নত মনে করে আমল করে না কেন? সমস্ত হাদিসকে সুন্নত মনে করে কখনো সাহাবাদের মতো মদ্য পান, কখনো ওজু করার স্বীয় স্ত্রীকে চুম্বন, কখনো রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে না কেন ?

উত্তরে হয়তো গায়ের মুকাল্লিদীন আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোকেরা বলবেন, ভাইজান। উপরিউক্ত হাদিসগুলি ও মনসুখ হয়ে গেছে। সুতরাং এই সব হাদিগুলির উপর আমল করা যাবে না।

এখানে আমরা বলব, আল্লাহর রাসুলে (সাঃ) এর হাদিস মনসুখ হয় কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নত কোনদিন মনসুখ হয় না। হাদিস শরীফে বর্ণিত এমন বহু হাদিস আছে যা আমল করা উম্মাতের জন্য নাজায়েজ কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতিটি সুন্নত যা আমল করা উম্মাতের জন্য জায়েজ এবং সওয়াবপূর্ণ।

সুতরাং হাদিস ও সুন্নত কোনদিন এক নয় তাই আহলে হাদিস ও আহলে সুন্নতও কোনদিন এক নয়।

হাদিসের মধ্যে বহু প্রকারভেদ আছে, সহীহ হাদিস, জইফ হাদিস, হাসান হাদিস, মুরসাল হাদিস, মরফু হাদিস, মৌকুফ হাদিস, মক্তু হাদিস, মওজু হাদিস। তাই হাদিসের প্রকৃতি বহু। কিন্তু সুন্নতের মধ্যে কোনো জাইফ নেই, মওজু নেই। তাই সুন্নতের প্রকৃতি এক।

সুতরাং হাদিস ও সুন্নত কোনদিন একদিন নয়, তাই আহলে হাদিস ও আহলে সুন্নতও কোনদিন এক নয়।

আহলে হাদিস বলা হয়, হাদিস, ফেকাহ, উসুলে হাদিস, উসুলে ফেকাহ, হাদিসের ভাষ্য গ্রন্থ, ইতিহাস, অসমায়ে রিজাল বা সনদে হাদিস ও একমাত্র হাদিস ও সনদে হাদিসের উপর খেদমতকারী অর্থাৎ মুহাদ্দিসীনদের বলা হয়। অর্থাৎ এক কথায় একমাত্র মুহাদ্দিসীনদেরকে আহলে হাদিস বলা হয়।

আর আহলে সুন্নত প্রত্যেক মুহাদ্দিসীন থেকে শুরু করে একজন মূর্খ জাহিল, অজ্ঞ গোঁয়ার লোককেও বলা হয়। অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নতের উপর যে কেউ আমল করবে তাকেই আহলে সুন্নত বলা হয়।

সুতরাং আহলে হাদিস ও আহলে সুন্নত কোনদিন এক নয়। গায়ের মুকাল্লিদিন সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে তারা আহলে হাদিস। কিন্তু আমরা জানি, হাদিসের মধ্যে বহু প্রকারভেদ আছে। যেমন, সহীহ হাদিস, জইফ হাদিস, মওজু হাদিস, হাসান হাদিস, মুরসাল হাদিস, মরফু হাদিস, মৌফুক হাদিস, মক্কতু হাদিস প্রভৃতি।

এখানে গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের লোকেরা কোন প্রকার আহলে হাদিস ? সহীহ আহলে হাদিস ? না জইফ আহলে ? হাদিস না মওজু আহলে হাদিস, না হাসান আহলে হাদিস না মুরসাল আহলে হাদিস, না মরফু আহলে হাদিস না মৌফুক আহলে হাদিস না মক্কতু আহলে হাদিস না নাসেক আহলে হাদিস, না মনসুখ আহলে হাদিস ? কোন প্রকার আহলে হাদিস ?

আমরা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত। আর আহলে সুন্নতের কোন প্রকারভেদ নেই। তাই আহলে হাদিস ও আহলে সুন্নত কোনদিন এক নয়। আর গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের লোকেরা যতই নিজেদেরকে আহলে সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত ম নে করে আস্ফালন করুক কিয়ামত পর্যন্ত তারা নিজেদেরকে আহলে সুন্নত বলে প্রমাণ করতে পারবে না।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)এর উক্তি নিয়ে বিভ্রান্তি

ফিৎনাবাজ গায়ের মুকাল্লিদীন আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোকেরা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর একটি উক্তি নিয়ে বড়ই আস্ফালন করে থাকে। তারা বলে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেছেন, "যখন সহীহ হাদিস সামনে এসে যাবে সেটাই আমার মজহাব।"

ইমাম আবু হানিফার এই উক্তিকে তারা খুব জোরে শোরে উম্মতের সামনে প্রচার করতে থাকে। তারা এই কথা বোঝাতে চায়, দেখ ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এখানে নিজের সাধুতার পরিচয় দিয়ে দিয়েছেন। তিনি শরীয়তে বিরোধী মশলা বর্ণনা করার পরেও এই উক্তির দ্বারা পরিস্কার বলে দিয়েছেন, আমার মশলার মোকাবিলায় কোনো সহীহ হাদিস এসে গেলে সেটাই আমার মজহাব। কিন্তু বিচার করলে দেখা যায়, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) উক্ত উক্তির অর্থ কখনই এই নয় যেখানেই সহীহ হাদিস পেয়ে যাবে সেটাই তাঁর মজহাব হয়ে যাবে এবং সেই হাদিসটা আমল করার যোগ্য হয়ে যাবে। কেননা এমন বহু পরস্পর বিরোধী অস্পষ্ট সহীহ হাদিস সিহাহ সিত্তাহ হাদিসগ্রন্থে বর্ণিত আছে যার রহস্য উদঘাটন করা আয়েমায়ে মুজতাহিদীনদের ইজতেহাদ ছাড়া সাধারণ আলেম উলামদের পক্ষে সম্ভব নয়। এবং সেই সহীহ হাদিসগুলি নাসেক না মনসুখ তাও বোঝা সাধারণ আলেম উলামার পক্ষে সম্ভব নয়।

এমন বহু সাধারণ মানুষ আছেন যাঁরা হাদিসের সামান্যতম জ্ঞান অর্জন করেছেন তাঁরাও জানেন এমন বহু সহীহ হাদিস আছে যা মনসুখ হয়ে গেছে যেমন আগুনের তৈরী হওয়া জিনিস খেলে ওজু ভেঙ্গে যাওয়া হাদিস সহীহ, কিন্তু এই হাদিস মনসুখ

হয়ে গেছে, ঠিক সেই রকম মুতা বিবাহ করার হাদিস বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, কিন্তু এই হাদিস মনসুখ হয়ে গেছে।

সুতরাং ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর উপরিউক্ত উক্তির অর্থ কখনই এই নয় যে, যেখানেই সহীহ হাদিস পেয়ে যাবে সেটাই তাঁর মজহাব হয়ে যাবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন, "সাধারণ মানুষ যখন কোন হাদিস শুনবে তার জন্য জায়েজ নয় যে বাইরে থেকে হাদিস থেকে সে যা বুঝবে তার উপর আমল করবে। কেননা, বাইরে থেকে হাদিস থেকে সে যা মানে বুঝবে সেটা মনসুখ হতে পারে।" (কেফায়া)"

সুতরাং ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর উক্ত উক্তির অর্থ কখনই এই নয় যে, যেখানেই সহীহ হাদিস পেয়ে যাবে সেটাই তাঁর মজহাব হয়ে যাবে এবং সেই সহীহ হাদিসটি আমল করার যোগ্য হয়ে যাবে।

সহীহ হাদিস কি কেবল সিহাহ সিত্তার মধ্যেই রয়েছে?

গায়ের মুকাল্লিদিন আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রোপাগান্ডা করে বেড়ায় যে সহীহ হাদিস কেবলমাত্র সিহাহ সিত্তার মধ্যেই মওজুদ রয়েছে। সিহাহ সিত্তাহ ছাড়া অন্য কোন হাদিস গ্রন্থকে তারা সহীহ বলতে রাজি নয়। কেউবা কেবল বুখারী-মুসলিমকেই সহিহ বলে, কেউবা আবার বুখারীকেই সহিহ বলে। অথচ সিয়াহ সিত্তাহ ছাড়া এমন বহু হাদিস গ্রন্থ রয়েছে যার মধ্যে বহু হাদিস সিয়াহ সিত্তার

থেকেও বেশী সহীহ। যেমন, মুসনাদে ইমামে আজম, মুসনাদে আহমদ, মুসান্নিকে আব্দুর রাজ্জাক, মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, মুআত্বা ইমাম মালেক, মুআত্বা ইমাম মুহাম্মদ, ত্বাহাবী শরীফ, মুসনাদে আবু ইয়ালা, সুনানে দারিমী, দারকুতনী, মুসনাদে হুমাইদি, সহীহ ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ প্রভৃতি।

এমন বহু সহীহ হাদিস রয়েছে যা সিয়াহ সিত্তাহর মধ্যে পাওয়া যায় না কিন্তু সিয়াহ সিত্তাহ ছাড়া অন্য হাদিস গ্রন্থে পাওয়া যায়। সুতরাং কেবলমাত্র সিয়াহ সিত্তার মধ্যেই সহীহ হাদিস আছে একথা বলা মারাত্মক ভূল।

তবে একথা ঠিক যে সিয়াহ সিত্তার মধ্যে সংকলিত অধিকাংশ হাদিসই সহীহ তার মানে এই নয় যে সিয়াহ সিত্তাহ ছাড়া অন্য হাদিস গ্রন্থে জইফ হাদিস বর্ণিত আছে। আল্লাহর কোরআনের পরে মুসলমান সমাজে বুখারী শরীফের স্থান দ্বিতীয়। তবুও মুসনাদে আহমদ, মুসান্নিফে আব্দুর রাজ্জাক, মুয়াত্বা ইমাম মুহাম্মদ, তাহাবী শরীফ প্রভৃতি হাদিস গ্রন্থে এমন হাদিসও বর্ণিত আছে যা বুখারী শরীফের হাদিসের থেকে এইসব হাদিস গ্রন্থের হাদিসের সনদ অধিক মজবুত ও সহীহ।

সুতরাং বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, ইবনে মাজা শরীফ, নাশাই শরীফ প্রভৃতি হাদিস গ্রন্থেই কেবল সহীহ হাদিস আছে অন্য হাদিস গ্রন্থে সহীহ হাদিস নেই একথা মনে করা বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

ইমাম নববী (রহঃ) মুসলিম শরীফের শারাহ গ্রন্থ ‘মুকাদ্দামা শারাহ মুসলিম’ এর মধ্যে লিখেছেন, যখন ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত ইবনে ওয়ারাহ (রহঃ) এর

খেদমতে হাজির হলেন তখন হজরত ইবনে ওয়ারাহ (রহঃ) ইমাম মুসলিম (রহঃ) কে বললেন, তোমার এই মুসলিম শরীফ দেখে বিদআতীদের এটা বলার সুযোগ হয়ে যাবে যে সমস্ত সহীহ হাদিস কেবলমাত্র মুসলিম শরীফেই সংকলিত আছে, কেবলমাত্র মুসলিম শরীফ ছাড়া অন্য হাদিসগ্রন্থ গ্রহণযোগ্য নয়। তখন ইমাম মুসলিম (রহঃ) জবাব দিয়েছিলেন, হযরত ! এই গ্রন্থ সংকলিত করে কেবলমাত্র এটাই বলেছি যে এর মধ্যে যত হাদিস বর্ণিত আছে তা সব সহীহ। আর আমি এরকম কথা একদম বলি নাই যে যেসব হাদিস এই গ্রন্থে বর্ণিত নাই তা জইফ। আমার উদ্দেশ্য কেবল এটাই যে সহীহ হাদিসের সংকলিত গ্রন্থ আমার কাছে এবং আমার ছাত্রদের কাছে সংকলিত থাকুক যা অনুসরণ যোগ্য হয়। তখন ইবনে ওয়ারাহ (রহঃ) ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর গ্রন্থটিকে কবুল করে নিলেন এবং প্রশংসা করলেন।

সুতরাং এখানে ইমাম মুসলিম (রহঃ) এর এই উক্তি থেকে পরিস্কার প্রমাণ হয় সহীহ হাদিস মুসলিম শরীফ ছাড়া এবং সিয়াহ সিত্তাহ ছাড়া অন্য হাদিস গ্রন্থেও ম ওজুদ আছে। তাই কোন মুজতাহিদ যদি সিয়াহ সিত্তাহ ছাড়া অন্য হাদিস গ্রন্থ থেকে হাদিস গ্রহণ করে মশলা ইস্তেমাত করেন তাহলে তা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য হবে।

কোরআনের আয়াত নিয়ে বিভ্রান্তি

মহান আল্লাহপাক কোরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন, “ইয়া আইয়্যুহাল লাযিনা আমানু আতিউল্লাহ করা আতিউর রসুল ওয়া উলিল আমর মিনকুম” অর্থাৎ----হে ঈমানদারগ ! তোমরা আল্লাহকে অনুসরণ কর এবং তাঁর রসুলকে অনুসরণ কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা ‘উলিল আমর’ তাদেরকে অনুসরণ কর।

এখানে আহলে সুন্নতুল জামাআতের প্রত্যেক মুফাসসির এই আয়তের ব্যখ্যায় ‘উলিল আমর’ বলতে মুজতাহিদীনদেরকে বুঝিয়েছেন। যাঁরা কোরআন ও হাদিস থেকে ইজতেহাদের মাধ্যমে মশআলা মাশায়েল ইস্তেম্বাত করতে পারেন। কিন্তু গায়ের মুকাল্লিদীন আহলে হাদিস সপ্রদায়ের লোকেরা কোরআন শরীফের এই আয়াতের ব্যখ্যায় বলে, এখানে ‘উলিল আমর’ বলতে কেবল দেশের শাসককে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তদন্ত করে দেখা যায়, উক্ত আয়াতের এরকম ধরণের ব্যাখ্যা বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা ‘উলিল আমর’ বলতে যদি দেশের শাসককেই বোঝানো হয় তাহলে নিশ্চয় ভারতবাসীরা কোরআনের এই আয়াতের ব্যাখ্যা করবে “তোমরা আল্লাহকে অনুসরণ কর এবং তাঁর রসুলকে অনুসরণ কর এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে অনুসরণ কর”।

আমেরিকার মুসলমানরা এই আয়াতের ব্যাখ্যা করবে, “তোমরা আল্লাহকে অনুসরণ কর এবং তাঁর রসুলকে অনুসরণ কর এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক হোসেন ওবামাকে অনুসরণ কর”।

বাংলাদেশের মুসলমানরা এই আয়াতের ব্যাখ্যা করবে, “তোমরা আল্লাহকে অনুসরণ কর এবং তাঁর রসুলকে অনুসরণ কর এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালিদা জিয়াকে অনুসরণ কর”।

এইভাবে প্রত্যেক দেশের মুসলমান জনতা তারা তাদের দেশের শাসকদেরকে অনুসরণ করবে। অর্থাৎ ইসলামি দেশের জনগণ মুসলমান শাসকদেরকে অনুসরণ

করবে এবং অমুসলিম দেশের জনগণ অমুসলিম শাসকদেরকে অনুসরণ করবে। এটাই কি গায়ের মুকাল্লিদীন আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের ফতোয়া ?

অর্থাৎ এক কথায় দেশের শাসক যদি মূর্তী পূজক, বহু ঈশ্বরবাদী, মুশরিক, কাফের, ফাসেক, লম্পট, চরিত্রহীন, মাতাল, গাঁজাখোর হয়, তাহলে গায়ের মুকাল্লিদীন আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের ফতোয়া অনুযায়ী সেই শাসককে অনুসরণ করে শাসকের মতো উপরিউক্ত চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।

আর আমাদের একথা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না, কোরআন শরীফের উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করে বৃটিশ শাসনকালে তৎকালীন আহলে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদীন সম্প্রদায়ের উলামারা 'উলিল আমর'-এর অনুসরণ করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের চামচাগিরি করেছেন। এবং বৃটিশদের বিরুদ্ধে জেহাদ করাকে হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

সত্যই এই বহুরূপী গায়ের মুকাল্লিদীন অহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোকেদের রহস্য বোঝা ভার !

এরা কোন ধরনের আহ্লে হাদিস ?

গায়ের মুকাল্লিদীন আহ্লে হাদিস সম্প্রদায়ের লোকেরা বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর 'গুনিয়াতুত্ ত্বালেবীন' কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে সাধারন মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। কখনো তারা উক্ত কেতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে

হানাফীদের মরজিয়া প্রমাণ করার চেষ্টা করে। কখনো তারা নিজেদেরকে জান্নাতী প্রমান করার চেষ্টা করে। সেই ‘গুনিয়াতুত্‌ ত্বালেবীন’ কেতাবে বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) শয়তানের জন্মরহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

“মুকাতিল জুহরী থেকে, তিনি হযরত উমার (রাঃ) থেকে এবং হযরত উমার (রাঃ) হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, একদা হজরত আবু বাকর, উমার, উসমান, আলী, সালমান, আম্বার ইবনে ইয়াসার (রাঃ) ও আরো অন্য সাহাবাগন রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর খোঁজে এলেন। এই সময় তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর কপালে ঘামের বিন্দুগুলো মুক্তার মত শোভা পাচ্ছিল। তিনি তা মুছতে মুছতে তিনবার বললেন, এই মালাউনের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ। হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্‌ (সাঃ)! আমার বাপ-মা আপনার প্রতি কোরবান হোক। আপনি কাকে এই রকম অভিশাপ দিলেন ? রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, শয়তানের উপর। সেই মরদুদ নিজ লেজ গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করিয়ে সাতটি ডিম প্রসব করেছে। তার থেকে সাতটি বাচ্চা জন্মেছে যারা মানব সন্তানকে ছলনা ও প্রতারণা করার জন্য নিযুক্ত হয়েছে। তাদের একটির নাম তাদহেশ। তার কাজ আলেম ব্যক্তিদের লোভ-লালসায় উদ্বুদ্ধ করা এবং বিভিন্ন কু-আবৃত্তিতে আকৃষ্ট করা। তাদের একটির নাম হাদীস। সে নামাজীদের জন্য নির্দিষ্ট।” (গুনিয়াতুত্তালেবীন, পৃঃ ১৩৫)

গুনিয়াতু-ত্বালেবীনের বর্ণিত উপরিউক্ত হাদিসে বলা হয়েছে, শয়তানের সাতটি সন্তানের মধ্যে একটি সন্তানের নাম ‘হাদিস’। আর এই ‘হাদিস’ নামক শয়তানের

বাচ্চার নুৎফায় তৈরী হওয়া সম্প্রদায় হল বর্তমানের গায়ের মুকাল্লিদীন আহ্লে হাদিস সম্প্রদায়ের লোকেরা।

আর উক্ত হাদিসে এও বলা হয়েছে, 'হাদিস' নামক শয়তানটি নামাজীদের জন্য নির্দিষ্ট। অর্থাৎ এই শয়তানটি নামাজের মধ্যে নামজীদের মনে আসওয়াসা সৃষ্টি করে। আর লক্ষ করলে দেখা যায়, বর্তমানের আহ্লে হাদিশ সম্প্রদায়ের লোকেরা মানুষকে কেবলমাত্র নামাজের মাশআলা দিয়েই মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকে। তারা বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি হাদিশের উদ্ধৃতি দিয়ে যারা রফে ইদাইন করে না তাদেরকে রফে ইদাইন করার নির্দেশ দেয়। যারা ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়েনা তাদেরকে সুরা ফাতেহা পড়ার নির্দেশ দেয়। যারা নাভির নীচে হাত বাঁধে তাদেরকে বুকের উপর হাত বাঁধার নির্দেশ দেয়। যারা নামাজে আস্তে আমীন বলে তাদেরকে জোরে আমীন বলার নির্দেশ দেয়। এরপর সাধারণ মানুষ যখন উলামায়ে আহ্নাফের কাছে শ্মরণাগত হয় তখন তাঁরা আহ্লে হাদিশ উলামাদের বিপক্ষে সহীহ্ হাদিশ পেশ করে বুখারী, মুসলিম শরীফের হাদিশ গুলোকে মনসুখ প্রমাণ করে থাকেন। তখন সাধারণ মানুষ নাসেখ - মনসুখ প্রভৃতি হাদিশের গোলকধাঁধা বুঝতে না পেরে গায়ের মুকাল্লিদীন ফিরকার চক্রান্তে পড়ে হাদিশের ব্যাপারে সন্দীহান হয়ে বেঈমান হয়ে মারা যায়।

সুতরাং এই 'হাদিস' নামক শয়তানের নুৎফায় পয়দা হওয়া আহ্লে হাদিশ সম্প্রদায়ের হাত থেকে বেঁচে থাকা আমাদের প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

তকলিদ শব্দটি কোরআন ও হাদিসে নেই কেন ?

১নং প্রশ্ন ঃ আহলে হাদিস ফিরকার লোকেরা অনেকে প্রশ্ন করেন, ‘তকলীদ’ শব্দের কোন নামও নিশানা ও নির্দেশ কোরআন হাদিসে পাওয়া যায় না। তাহলে ‘তাকলীদ’ ওয়াজীব হয় কি করে ?

উত্তর ঃ কোরআন ও হাদিসে ‘তাকলীদ’ শব্দটি খুঁজে পাওয়া যায় না ঠিকই তবে ইতাআত, ইক্তিদা ও ইত্তেবা এই তিনটি জিনিসের নির্দেশ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাঃ) মুমিন মুসলমানদেরকে দিয়েছেন।

এখানে আমাদের বক্তব্য হল, ‘তাকলীদ’ শব্দটি কোরআন ও হাদিসে নেই তাবলে তকলীদ করা যাবে না একথা ঠিক নয়। কেননা ‘তওহীদ’ হল ইসলামের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সেই ‘তওহীদ’ শব্দটিও কোরআন ও হাদীসে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাবলে কি ইসলামে তওহীদের কোন গুরুত্ব নেই ?

অনুরূপভাবে কোরআন ও হাদীসের মধ্যে কোথাও সহীহ হাদিস, যয়ীফ হাদিস, ম ওযু হাদিস, হাসান হাদিস, মুরসাল হাদিস, মরফু হাদিস, মক্তু হাদিস, নাসেক হাদিস, মনসুখ হাদিস প্রভৃতি শব্দও নেই। তাবলে কি ইসলামে এর কোন গুরুত্ব নেই?

অনুরূপভাবে আরও বলা যায়, হাদীসে গম, যব, খেজুর, লবণ, সোনা ও রূপা এই ছ'টি জিনিসের সুদের কথা উল্লেখ করা আছে, কিন্তু কোরআন হাদিসে কোথাও ডলার, পাউণ্ড, টাকা প্রভৃতির নাম ও নিশানা পাওয়া যায় না তাবলে কি ইসলামে এগুলোর কি সুদ নেওয়া জায়েজ হয়ে যাবে ?

'তকলীদ' শব্দের অর্থ হল অনুসরণ করা। আর আয়েম্মায়ে কেরামদের অনুসরণ করার কথা কোরআন শরীফে পরিস্কারভাবে বর্ণনা করা আছে। যেমন মহান আল্লাহপাক কোরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন, ''আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রসুল ওয়া উলিল আমার মিনকুম'' অর্থাৎ-তোমরা আল্লাহকে অনুসরণ কর এবং আল্লাহর রসুল (সাঃ)কে অনুসরণ কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা 'উলিল আমর' (মুজতাহিদ, ফকিহ) তাদেরকে অনুসরণ কর।

সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা তকলীদের কথা পরিস্কার প্রমাণিত হয়। এখন যদি কোন আহলে হাদিস ফিরকার লোক এসে বলেন 'তকলিদ' কথাটি কোরআন-হাদিসে কোথাও নেই তাই তাকলীদ মানব না। তাহলে আমরা একটি কথায় বলব, 'তওহীদ' শব্দটিও তো কোরআন-হাদিসে কোথাও নেই তাহলে কি তাঁরা তওহীদ-কে মানতে অস্বীকার করবেন ?

ইমামগণের তরফ থেকে তকলিদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা

প্রশ্ন নং ২ ঃ আহলে হাদিস ফিরকার অনেকে প্রশ্ন করেন, যে 'তাকলীদ' করাকে ওয়াজীব বলা হয়েছে, সেই তাকলীদকে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) নিষেধ করে

গেছেন। তিনি বলেছেন "তোমরা আমার তকলীদ কর না। ইমাম মালিকের ও তকলিদ কর না। অন্য কোন ব্যক্তির তকলীদ কর না। ইসলামী বিধান সেখানে থেকে গ্রহণ কর, যেখান থেকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে।"

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) যদি তাকলীদ করতে নিষেধ করে থাকেন তাহলে তাকলীদ পরিত্যাগ করা ওয়াজীব হবে না কেন ?

উত্তর ঃ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর এই উদ্ধৃতি দ্বারা গায়ের মুকাল্লিদ ফিরকার লোকেরা হানাফীদেরকে অপদস্ত করার প্রয়াস করেন। কিন্তু মুহাদ্দীসিনে কেরামরা মন্তব্য করেছেন যে ইমাম সাহেব (রহঃ)-এর উক্ত মন্তব্য কেবল মাত্র সেইসব মুজতাহীদদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাঁরা কুরআন ও হাদিস থেকে মাসআলা ও মাসায়েল ইস্তেম্বাত বা আবিষ্কার করতে পারেন।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) লিখেছেন, "ইমামগণের তকলীদ থেকে নিষেধাজ্ঞা, একমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই যারা দলীল-দালাইল থেকে মাসআলা-মাসাইল আবিষ্কার করতে সক্ষম।" (ফতোয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া, পৃষ্ঠা-২০৩)

ভারত বিখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন, "এটা কেবলমাত্র তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের মধ্যে কিছুটা 'ইজতিহাদ' (গবেষণা) করার ক্ষমতা আছে।" (হুজ্জাতুল্লাহি বালিগাহ, পৃষ্ঠা-১৫৪--১৫৫)

সুতরাং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর উক্ত উক্তি সাধারণ মানুষ ও সাধারণ আলেম-উলামাদের জন্য প্রযোগ্য নয়, এটা কেবল মাত্র সেই সকল মুজতাহিদদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যারা ইজতেহাদ করে মাসালা মাসায়েল ইস্তেম্বাত (গবেষণা) করতে পারেন।

চার ইমামের আগেও কি তাকলিদ জারি ছিল ?

প্রশ্ন নং ৩ ঃ আহলে হাদিস দলের লোকেরা প্রশ্ন করেন চার ইমামের আগে এই তাকলীদ জারী ছিল কিনা ?

উত্তর ঃ চার ইমামের আগে অবশ্যই এই তাকলিদ জারি ছিল। এই তাকলীদ সাহাবায়ে কেরামদের যুগ থেকে চলে আসছে। আহলে হাদিস দলের লোকেরা মনে করেন তাকলীদ সাহাবায়ে কেরামদের যুগে চালু ছিল না। এটা তাঁদের ভুল ধারণা। ভারত বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন, "মানুষেরা সাহাবায়ে কেরামদের যুগ থেকে চার মজহাবের বিস্তার লাভ করা পর্যন্ত উলামাদের মধ্যে যাকে সম্ভব হত ধারাবাহিকভাবে তকলীদ করেছেন। গ্রহণযোগ্য নিষেধ বিহীন এটা হয়েছে। যদি তকলীদ করা ভুল হত, তাহলে তাঁরা অবশ্যই এটা (তাকলীদ করতে) নিষেধ করতেন।" (একদুল জিদ, পৃষ্ঠা-২৯)

সুতরাং শাহ ওয়ালীল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ)-এর কথা অনুযায়ী চার ইমামের আগে থেকেও তাকলীদ জারী ছিল। যেমন আল্লামা যাহাবী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থে হজরত

আলকমা তাবেয়ী (রহঃ) এর আলোচনায় লিখেছেন, “হজরত আলকামার কাছ থেকে সাহাবাগান ফতোয়া নিতেন।” (তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায্‌, পৃষ্ঠা--৩৯)

এখানে বোঝা যায়, বহু সাহাবীও মুজতাহিদ ছিলেন না। সেজন্য তাঁরা মুজতাহীদ তাবেয়ীনদের ফতোয়ার তকলীদ করতেন। আল্লামা কামালুদ্দিন ইবনে হুমাম বলেন, “হুজুর (সাঃ) এক লক্ষ সাহাবী রেখে ইহজগৎ ত্যাগ করেন। ঐ এক লক্ষের মধ্যে মাত্র কুড়ি জন সাহাবী মুজতাহিদ ছিলেন। (ফতলুর কাদির)

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, কূফাবাসীরা হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর তকলীদ করতেন। যেমন বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, একদা হজরত আবু মুসা আশয়ারী (রহঃ)-এর কাছে কিছু মানুষ ‘অরাসাত’ (মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন) সম্পর্কে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তিনি সেটার উত্তর তো দিলেন, তবে শেষে এও বললেন-তোমরা যাও ! আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের কাছে এটা জিজ্ঞেস করে নাও। তারা ইবনে মাসউদের কাছে গিয়ে সেটা জিজ্ঞাসা করল এবং তাঁকে সেই মাসআলা সম্পর্কে আবু মুসা আশায়ারীর প্রদত্ত রায়ও শোনাল। হযরত ইবনে মাসউদ সেই মাস আলায় আবূ মূসা আশয়ারীর খেলাপ ফতওয়া দিলেন। এবার মানুষেরা যখন পুনরায় আবু মূসা আশয়ারীর কাছে এসে ইবনে মাসউদের ফতওয়া শোনাল, তখন আবূ মূসা আশয়ারী তাদেরকে বললেন, “যতদিন এই পণ্ডিত আলিম (আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ) তোমাদের মাঝে আছেন; ততদিন তোমরা আমার কাছে মাসআলা-মাসাইল জিজ্ঞাসা কর না।”(বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-৯৯৭)

এই হাদিস দ্বারা পরিস্কার বোঝা যায় হজরত আবু মুসা আসআরী (রাঃ) হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) এর তাকলীদ করতে বলেছেন।

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত আছে, মদীনাবাসীরা হজরত জায়েদ (রাঃ) এর তকলীদ করতেন। হজরত ইকরিমা থেকে বর্ণিত, একদা মদীনাবাসীরা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, যে মহিলার (ফরয) তাওয়াফের পর মাসিক এসে গেল, তার হুকুম কী ? ইবনে আব্বাস(রাঃ) তাদেরকে বললেন-এরূপ মহিলা (বিদায়ী তাওয়াফ না করে মক্কা থেকে) চলে যেতে পারে। উত্তর শুনে মদীনাবাসীরা বললেন,"আমরা যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) এর উক্তি ছেড়ে আপনার কথার উপর আমল করব না।" প্রতুত্তরে হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, "তোমরা মদীনায় পৌঁছে (উম্মে সুলাইম ও অন্যান্যদের) জিজ্ঞেস করে নিও।" (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-২৩৭)

এই ঘটনা দ্বারা বোঝা গেল মদিনাবাসীরা হজরত যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) এর তকলীদ করতেন। সুতরাং চার ইমামের আগেও এই তাকলীদ জারী ছিল।

হাদিস সংকলনের পরও তকলিদের প্রয়োজন আছে

প্রশ্ন নং ৪ ঃ আহলে হাদিস ফিরকার লোকেরা বলেন, আগেকার যুগে বেশী হাদিস সংকলিত ছিল না তাই তখনকার যুগের লোকেরা ইমামগণের তাকলীদ করতেন। এখনকার যুগে নবী করীম (সাঃ) এর সমস্ত হাদিস গ্রন্থ আকারে সংকলিত আছে। তাই এখনকার যুগে আর তকলীদ করার কোন প্রয়োজন নেই।

উত্তর ঃ উত্তরে এখানে একটি কথায় বলব, হাদিস সংকলন করার পর যদি তাকলীদ করার কোন প্রয়োজন না থাকে তাহলে হাদিস সংকলনকারীরা কেন ইমামগণের তকলীদ করলেন ? যেমন ইমাম বুখারী (রহঃ) ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম আবু দাউদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ), ইমাম ইবনে মাজাহ (রহঃ), ইমাম নাসাই (রহঃ) এই ছয় সিয়াহ সিত্তাহ গ্রন্থের হাদিস সংকলনকারী প্রথিযশা মুহাদ্দিস। ইলমে হাদিসের পুরো ইমারত এঁদের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। তবুও তাঁরা ইমামগণের তাকলীদ করে গেছেন। যেমন ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদিস সংকলন করে নাম দিয়েছেন ‘বুখারী শরীফ’ তবুও তিনি ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর মুকাল্লিদ হওয়ার দরুণ শাফেয়ী মজহাবের লোক ছিলেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) হাদিস সংকলন করে নাম দিয়েছেন ‘মুসলিম শরীফ’ তবুও তিনি ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর মুকাল্লিদ হওয়ার দরুণ শাফেয়ী মজহাবের লোক ছিলেন। ইমাম নাসাই (রহঃ) হাদিস সংকলন করে নাম দিয়েছেন ‘নাসাই শরীফ’ তবুও তিনি ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর মুকাল্লিদ হওয়ার দরুণ শাফেয়ী মজহাবের লোক ছিলেন।

অপরদিকে আরও হাদিস সংকলনকারী মুদাদ্দিস ইমাম দারকুতনী (রহঃ) শাফেয়ী মজহাবের ছিলেন, ইমাম তাহাবী (রহঃ) হানাফী মজহাবের ছিলেন, ইমাম বাইহাকী (রহঃ) শাফেয়ী মজহাবের ছিলেন, ইমাম ইবনে অবদিল বার (রহঃ) মালিকী মজহাবের ছিলেন, ইমাম ইয়াহয়া ইবনে মায়ীন (রহঃ) যিনি দশ লক্ষ হাদিস নিজহাতে লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি একজন কট্টরপন্থী হানাফী ছিলেন, জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস আমিরুল মুমেনীন ফিল হাদিস আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) হানাফী ম জহাবের লোক ছিলেন ইমাম অকীঅ ইবনে জারাহ (রহঃ) হানাফী মজহাবের

ছিলেন, মুহাদ্দিসে আজীম হাফেজুল হাদিস আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) শাফেয়ী মজহাবের লোক ছিলেন, ইমাম নববী (রহঃ) শাফেয়ী মজহাবের লোক ছিলেন, ইমাম ইয়াহয়া বিন যাকারিয়া বিন আবী যাইদাহ (রহঃ) হানাফী ছিলেন, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) হাম্বলী মজহাবের লোক ছিলেন, আল্লামা ইবনে কায়্যিম (রহঃ) হাম্বলী মজহাবের লোক ছিলেন। ইমাম ইবনে সালাহ (রহঃ) শাফেয়ী মজহাবের লোক ছিলেন। ইমাম বাগবী (রহঃ) শাফেয়ী মজহাবের লোক ছিলেন।

এঁরা প্রত্যেকেই হাদিসের আসমানের এক একটি করে জ্বলন্ত নক্ষত্র ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই রিজাল শাস্ত্রের বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন তবুও তাঁরা নিজ নিজ ইমামের তকলীদ করে গেছেন।

আমাদের বক্তব্য, যাঁরা হাদিস সংকলন করলেন তাঁরাই যখন ইমামগণের তাকলিদ করেন তাহলে আমরা করব না কেন ? আর হাদিস সংকলন করার পর যদি তকলীদ করার কোন প্রয়োজন না থাকে তাহলে উপরিউক্ত মুহাদ্দিসরা হাদিস সংকলন করার পরও নিজ নিজ মজহাবে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছিলেন কেন ?

সুতরাং এসব থেকে বোঝা যায় হাদিস সংকলিত হওয়ার পরও তকলীদের প্রয়োজন আছে, তকলীদ পরিত্যাগ করা নিছক বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন লোক যদি চিকিৎসা শাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করে এবং চিকিৎসার সামগ্রী যদি সংগ্রহ করে মনে করে, ‘‘ডাক্তার খানায় যাবার আর

কোন প্রয়োজন নেই, আর ডাক্তারের কথা শোনারও কোন প্রয়োজন নেই, কেননা ডাক্তারের সমস্ত সামগ্রী আমার কাছে মওজুদ আছে।" তাহলে তার মত বোকা ও গোঁয়ার গোবিন্দ আর কেউ নেই। কেননা ডাক্তারের সমস্ত সামগ্রী তার কাছে মওজুদ থাকার পরও সে ঠিকমত চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী ওষুধ সেবন করতে পারবে না এবং নিয়মামাফিক কাউকে ওষুধও দিতে পারবে না।

আর সব থেকে বড় কথা হল, যদি কোন লোক চিকিৎসা শাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করে এবং সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করে জনসাধারণের মাঝে ডাক্তারী ফলাতে যায় আর মানুষকে ওষুধ দিতে আর করে দেয় আর প্রশাসন যদি জানতে পেরে যায় যে এই ব্যক্তি ডাক্তারী পাশ করেনি তবুও চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থ সংগ্রহ করে সাধারণ মানুষের সামনে ডাক্তারী ফলাতে যাচ্ছে তাহলে ব্যাটাকে তৎক্ষণাৎ হাজতে পুরবে। এমন কি তার ভুল চিকিৎসায় যদি কেউ মারাও যায় তাহলে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। যদি তার কাছে পাশ করা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট থাকত এবং চিকিৎসা করার জন্য সরকারী লাইসেন্স থাকত তাহলে তাকে কেউ কিছু বলত না এবং তার ভুল চিকিৎসায় রোগী মারা গেলেও প্রশাসন তাকে কিছু বলত না। কেননা চিকিৎসার করার জন্য তার কাছে সরকারী লাইসেন্স আছে।

অনুরূপ ভাবে কোন গায়ের মুকাল্লিদ যদি সিহাহ সিত্তাহ সহ সমস্ত হাদিস গ্রন্থ সংগ্রহ করে মনে করে, "ইমামদের কাছে যাবার আর কোন প্রয়োজন নেই। আর ইমামদের (মুজতাহিদদের) কথা শোনারও কোন প্রয়োজন নেই, কেননা ইমামদের সমস্ত সামগ্রী ইমামরা যেখান থেকে মাসআলা নিয়েছেন (অর্থাৎ কোরআন ও হাদিস)

আমার কাছ মওজুদ আছে।” তাহলে তার মতও বোকা ও গোঁয়ার-গোবিন্দ আর কেউ হবে না। কেননা, কোরআন ও হাদিস তার কাছে মওজুদ থাকার পরও সে ঠিকমত ইজতেহাদ (গবেষণা)- এর যোগ্যতা প্রয়োজন, সেই যোগ্যতা না থাকলে মাস আলা মাসায়েল ইস্তেম্বাত করতে পারবে না এবং নিয়ম মাফিক ঠিক মত ফতোয়াও সে প্রদান করতে পারবে না।

তবুও যদি উক্ত ব্যক্তি কোরআন ও হাদিস শাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থ যদি সংগ্রহ করে জনসাধারণের কাছে মাতব্বরী ফলাতে যায়, আর মানুষকে ফতোয়া দিতে আর করে দেয়, তাহলে আল্লাহ তাঁকে অবশ্যই পাকড়াও করবেন, কেননা যে ব্যক্তির ইজতেহাদ করার শক্তি নেই এবং ইজতেহাদ করে মাসআলা মাসায়েল ইস্তেম্বাত করার ক্ষমতাও সে রাখে না। তার ভুল মাসআলার কারণে কোন মানুষ যদি আমলের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে আল্লাহপাক অবশ্যই তাকে কিয়ামতের ময়দানে পাকড়াও করে জাহান্নামের বাসিন্দা বানিয়ে দেবেন। যদি তার কাছে ইজতেহাদ ক্ষমতা থাকত তাহলে তাকে কেউ কিছু বলত না এবং আল্লাহপাকও তাকে পাকড়াও করতেন না কারণ তার কাছে ইজতেহাদ করার ক্ষমতা আছে। আর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কোন মুজতাহিদ যদি সঠিক মাসআলা ইস্তেম্বাত করে তাহলে সে দুইটি নেকী পাবে আর যদি ভুল মাসআলা ইস্তেম্বাত করে তাহলে সেই একটি নেকী পাবে। (বুখারী শরীফ)

সুতরাং কেউ যদি মুজতাহিদ না হয় তাহলে নবী করীম (সাঃ) এর সমস্ত হাদিস সংকলন করার পরও তার জন্য তাকলীদ করার প্রয়োজন আছে। কারণ

একমাত্র মুজতাহিদ ছাড়া সাধারণ মানুষ ও সাধারণ আলেম উলামাদের তকলিদ ছাড়া গতি নেই।

চারশো হিজরীর আগের মযহাব

প্রশ্ন ৫ ঃ আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে, ৪০০ হিজরীর পর ইমামগণের অনুসরণ শুরু হয়েছে, আপনাদের কথায় ইমামের অনুসরণ (তকলীদ) বাধ্যতামূলক (ওয়াজীব) যাঁরা চার ইমামের আগে যে পদ্ধতিতে নামাজ রোজা করে গিয়েছেন তারা কি জাহান্নামী ? যদি তাঁরা সঠিক ছিলেন তবে আমরা গায়ের মুকাল্লিদরা কেন ঠিক নয় ?”

উত্তর ঃ এর উত্তর আমি আগেই দিয়েছি চার ইমাম আসার আগে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী বলে কেউ ছিল না ঠিকই। তবে চার ইমাম যেমন ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ইমাম মালেক (রহঃ) ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) যেখান থেকে মাসআলা মাসায়েল সংগ্রহ করেছেন সেই আল্লাহর কোর আন ও নবী করীম(সাঃ) এর হাদিস তো মওজুদ ছিল। চার ইমামের পূর্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হয় সাহাবী ছিলেন, না হয় তাবেয়ীন ছিলেন। তাঁরা যে আমল করতেন, সেগুলিই চার ইমাম সংগ্রহ করে একত্রিত করেছেন। অতএব তাঁরাও ঐ ভাবেই নামাজ পড়তেন, যেভাবে চার ইমাম পড়েছেন বা কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, যেমন তাঁরা বুখারী শরীফে বর্নিত হাদিশের উপর আমল করতেন, তখনকার নাম বুখারী ছিল না। ইমাম বুখারীর সংকলনের পর তার নাম হয়েছে বুখারীর হাদিশ। আহলে হাদিশ যারা কুরআন অনুসারে সাহাবা তাবেয়ীনদের বর্নিত নামাজ না পড়ে মনগড়া নামাজ

পড়ছেন ও মিথ্যা নামাজ শিখাচ্ছেন। সেই কোরআন ও হাদিস থেকে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গিত ইজতেহাদ করে চার ইমামগণ মাসআলা মাসায়েল ইস্তেম্বাত করে ফেকাহ শাস্ত্রকে দাঁড় করিয়েছেন। এই চার ইমাম আসার আগে মুসলমানেরা সাহাবাদের কাছ থেকে মাসআলা জেনে নিতেন এবং যেকোনো মুজতাহিদদের কাছ থেকেও মাস আলা জেনে নিতেন। সাহাবায়ে কেরামদের পর মাসআলা মাসায়েলের কোন গ্রন্থ মুসলমানদের মাঝে ছিল না। আর সাধারণ মুসলমানদের জন্য সরাসরি হাদিস থেকে মাসআলা সংগ্রহ করাও সম্ভবপর ছিল না।

যেজন্য তাঁরা যেকোন মুজতাহিদকে সামনে পেয়ে যেতেন তাঁর তকলিদ করে নিতেন। এরপর চার ইমাম পৃথিবীতে আসার পর চার ইমামের মজহাবের ব্যাপারে যেকোন একজন ইমামের তকলীদ করা উম্মতের মাঝে ইজমা হয়ে গেল। যেমন শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন, ‟সংকলিত সুবিন্যস্ত এই চার ম জহাবের তাকলিদ বৈধ (জায়েজ) হওয়ার উপর আজ পর্যন্ত গোটা উম্মত বা উম্মতের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গের ‘ইজমা’ হয়ে আছে।” (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, পৃষ্ঠা-১৫৪)

আল্লামা মুল্লা জীবন (রহঃ) লিখেছেন, ‟একমাত্র চার ইমামের তকলীদই জায়েজ বলে ‘ইজমা’ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আর নিরপেক্ষ কথা হল, মজহাব কেবল চারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া এবং শুধু চার ইমামের তকলিদের প্রচলন আল্লাহর বিশেষ করুণা ও তাঁর তরফ থেকে কবুলিয়াত।” (তফসিরে আহামাদিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-৩৪৬)

সুতরাং চার মজহাবের মধ্যে একটি মজহাবের তকলীদ করা হল উম্মতের মুহাম্মাদির ইজমা। আর ইজমা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “ইন্নাল্লাহা লা ইয়াজমা উম্মতা মুহাম্মাদন আলা সারহানা” অর্থাৎ আমার উম্মত গোমরাহীর উপর সমবেত (ইজমা) হবে না । তাই চার ইমামের মধ্যে একজন ইমামের তকলীদ করা ওয়াজীব হওয়ার ব্যাপারে যখন উম্মতের মধ্যে ইজমা হয়ে গেছে, তখন কোন মতেই চার মজহাব গুমরাহ নয়। যারা এই চার মজহাবের বাইরে অর্থাৎ গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের লোকেরাই গুমরাহ।

আর কোরআন শরীফ থেকেও ইজমার প্রমাণ আছে। মহান আল্লাহপাক কোরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন, “আর যে কেউ রসুলের বিরুদ্ধাচারণ করবে, তার কাছে হিদায়াত প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পন্থা (অর্থাৎ ইজমায়ী আমল) ছেড়ে অন্য পথ অনুসরণ করবে, আমি তাকে (দুনিয়াতে) ঐ দিকেই ফেরাব যেদিকে সে ধারণ করেছে এবং (অখিরাতে) তাকে জাহান্নামে দগ্ধীভূত করব। আর জাহান্নাম নিকৃষ্ঠতম গন্তব্যস্থল।” (সুরা নিসা, আয়াত নং--১১৫)

মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ) তাফসিরে মাআরেফুল কুরআনে এই আয়াতের তফসিরে লিখেছেন, “এই আয়াতে দুটি জিনিসের মারাত্মক অপরাধ ও জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হওয়া উল্লেখ করা হয়েছে। ১) রসূল (সাঃ) এর বিরুদ্ধাচারণ। আর এটা স্পষ্ট যে, রসূলের বিরোধিতা কুফর ও মহাপাপ। ২) যে কাজের উপর সমস্ত মুসলমান একমত, সেটা ছেড়ে তাদের খেলাপ কোন পথ ধারণ করা। এ দ্বারা বোঝা যায় যে, উম্মতের ইজমা দলীল। অর্থাৎ যেমন ভাবে কুরআন হাদীসে বর্ণিত বিধানাবলীর উপর আমল করা অপরিহার্য, তেমনই ভাবে যে বিষয়ে উম্মতের ঐক্যমত

প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তার উপর আমল করা জরুরী। তার বিরুদ্ধাচারণ করা মস্ত বড় পাপ। যেমন, নবী (সাঃ) একটি হাদীসে ইরশাদ করেছেন আল্লাহর (রহস্যতর) হাত জামাআতের (মাথার) উপর থাকে; যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাআতের থেকে আলাদা হবে, সে পৃথক ভাবে জাহান্নামে পতিত হবে। হযরত ইমাম শাফিয়ীর কাছে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল যে, উম্মতের ইজমা দলীল হওয়ায় (প্রমাণ যেমন হাদীসে আছে, তেমন এর) কোন প্রমাণ কুরআন মজীদে আছে কি ? তখন ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) কুরআন থেকে প্রমাণ জানার জন্য ধারাবাহিক ভাবে তিন দিন কুরআন মজীদ তিলাওয়াতে মশগুল থাকলেন। প্রত্যহ দিন তিনবার ও রাতে তিনবার পূর্ণ কুরআন খতম করতেন। পরিশেষে, এই উল্লেখিত আয়াতটি মাথায় এল এবং তিনি এটা উলামাদের সম্মুখে পেশ করলেন। তখন সকলেই স্বীকার করল যে, ইজমা শরীয়তের দলীল হওয়ার জন্য এই প্রমাণটি যথেষ্ট।" (তফসীরে মাআরিফুল কুরআন, পৃষ্ঠা-৫৪৬)

কুরআন শরীফের উক্ত আয়াতের তফসীরে বলা হয়েছে, মুসলমানদের জামাআত থেকে যে ব্যক্তি আলাদা থাকবে এবং ইজমাকে অমান্য করবে সে ব্যক্তি জাহান্নামে পতিত হবে। আর যেহেতু চার ইমামের মধ্যে একটি ইমামের তকলীদ করা উম্মতে মুসলিমার মধ্যে ইজমা হয়ে গেছে তাই যে ব্যক্তি উম্মতের ইজমাকে অস্বীকার করতঃ চার ইমামের মধ্যে যে কোন একজন ইমামের তকলীদ করবে না এবং মুসলমানদের জামাআত থেকে পৃথক থাকবে সে ব্যক্তি পৃথকভাবে জাহান্নামে পতিত হবে।

আল্লামা তাহতাবী (রহঃ) 'হাসিয়া দুর্রুল মুখতারের' মধ্যে বলেছেন, বলেছেন, "অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাদের যুগে এই চার মজহাব (হানাফী শাফেয়ী, মালেকী ও

হাম্বলী) থেকে খারিজ থাকবে তাহলে সে বিদআতী ও জাহান্নামী।”(আওসাহতাল জিদ, পৃঃ ১৯)

আর যেহেতু গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের লোকেরা চার মজহাব থেকে খারিজ হয়ে আছে তাই তারা আল্লামা তাহতাবী (রহঃ) এর ফতোয়া অনুযায়ী বিদআতী ও জাহান্নামী হতে বাধ্য।

ইমাম আবু হানিফার আববা কোন মযহাবের লোক ছিলেন?

প্রশ্ন নং-৬ ঃ আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রশ্ন করেন ইমাম আবু হানিফার আববা কোন ইমামের অনুসরণ করেছেন ?”

উত্তর ঃ এরকম ধরণের প্রশ্ন নিছক বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করেন, হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আববা কোন নবীর উম্মত ছিলেন ? এর উত্তর প্রত্যেক মুসলমান মাত্রেই জানেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর আববা আব্দুল্লাহ হজরত ইসা (আঃ) এর উম্মত ছিলেন। ঠিক সেই রকম ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর আববা সাবিত (রহঃ) ইমাম আর হানিফা (রহঃ) এর আগে যে সব মুজতাহিদ ছিলেন তাদের মধ্যে কোন একজন মুজতাহিদের মুকাল্লিদ ছিলেন। সাহাবা ও তাবেয়ীনদের পদ্ধতিগুলি চার ইমাম সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেছেন।

হানাফীদের দলীল কি দুর্বল ?

প্রশ্ন নং ৭ ঃ আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোকেরা হানাফীদের প্রতি অভিযোগ করে বলে, ‘‘হানাফীদের দলীল যইফ, মওজু ইত্যাদি আমাদের (আহলে হাদিসদের) দলীল মজবুত।’’

উত্তর ঃ আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের এরকম ধরণের কথা নিছক ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা হানাফীদের কোন দলীল যইফ ও মওজু নয়। প্রত্যেকটি দলীলই কোরআন ও সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যা এর আগে প্রমাণ করে দেওয়া হয়েছে। যেমন, রফে ইয়াদাইন না করা, ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়া, তিন তালাক তিন তালাকই হওয়া, ২০ রাকাত তারাবীহর নামাজ পড়া, আস্তে আমীন বলা প্রভৃতি প্রত্যেকটি মাসআলাই সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সেগুলো কোন গায়ের মুকাল্লিদ ফিরকার হালালী সন্তান যইফ বা মওজু বলে প্রমাণ করতে পারে নি। আর কিয়ামত পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারবে না ইনশাল্লাহ। আর হানাফী মজহাবে যে মাসায়েলগুলি জইফ প্রমাণিত হয়েছে সেগুলো ফজীলতের অধ্যায়ে। আসলে সহীহ হাদিস, যইফ হাদিস এগুলি হল মুহাদ্দিদের পরিভাষা। সহীহ হাদিস যেমন সকল ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, ঠিক তেমনি যইফ হাদিস ফজীলতের অধ্যায়ে গ্রহণযোগ্য। আর ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) যখন সহীহ হাদিসে সমস্যার সমাধান পাননি তখন তিনি কিয়াস না করে যইফ হাদিসকে গ্রহণ করেছেন। যেমন আল্লামা ইবনে কায়্যিম (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন,

"ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর সকল অনুসারীগণের ঐক্যমতে ইমাম আবু হানিফার নিকটে যইফ হাদিস কিয়াস ও রায় অপেক্ষা প্রাধান্যযোগ্য। আর তিনি এর উপরই স্বীয় মশলাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।"(আলামুল মুওয়াক্কিয়ীন, পৃষ্ঠা-৬১)

আর ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কিয়াস ও রায় পেশ না করে যইফ হাদিস থেকে মাসআলাকে লিপিবদ্ধ করেছেন সেসব মসআলার বিরুদ্ধে সহীহ হাদিস পেশ করে কোন গায়ের মুকাল্লিদ বা আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোক হানাফীদের ম সলককে খণ্ডন করতে পারেন নি। আর তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত পারবেন না ইনশা আল্লাহ।

আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের আলেমরা তাদের গ্রন্থে যেসব মাশআলা বর্ণনা করেছেন সেগুলো সহীহ হাদিস তো দূরের কথা যইফ কিংবা মওযু হাদিস থেকেও প্রমাণিত হয় না। আহলে হাদিস ফিরকার কিছু মাসআলা নিচে বর্ণনা করা হল,

১) শূকর পবিত্র পশু (বদরুল আহিল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৫-১৫)

২) হায়েজ ও নেফাসের রক্ত ব্যতিত সকল পশু ও মানুষের রক্ত পবিত্র। (উরফুল জাদি, পৃষ্ঠা-১০)

৩) একহাতে মুসাফা করা জায়েজ। (তুহফাতুল আহওয়াযি, পৃষ্ঠা-৪২৯)

৪) গায়ের মুকাল্লিদদের নিকট বীর্য পবিত্র। (বদরুল আহিল্লাহ)

৫) সুদ নেওয়া জায়েজ। (আল বুনইয়ানুল মারসুম মিন বয়ানে ইযাসিল মানসুস, পৃষ্ঠা-৬৭)

৬) মৃত পশু পবিত্র। (দ্বালিলুত ত্বালিব, পৃষ্ঠা-২২৪)

৭) হাশারাতুল আরয খাওয়া হালাল। যেমন-টিকটিকি, ডাঙ্গর ব্যাঙ, পিঁপড়ে, গোবরপোকা, কচ্ছপ, ছুঁচো, অজগর সাপ, মাকড়সা, খুন, রেশমপোকা, বিছে, সাপ, মৌমাছি, ভিমরুল, প্রজাপতি, বাঁদর, মাছি আহলে হাদিসদের নিকট খাওয়া হালাল। (কানযুল হাকায়েক, পৃষ্ঠা-১৮৬)

৮) মদ পবিত্র বস্তু। (উরফুল জাদি, পৃষ্ঠা-২৪৫)

৯) শূকর ও কুকুরের মণি পাক। (নজলুল আবরার)

১০) আহলে হাদিসদের ফতোয়া অনুসারী কোন মহিলার সঙ্গে জ্বেনা করার পর তার গর্ভ থেকে যদি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে সেই কন্যার সঙ্গে জ্বেনাকারী পিতার বিবাহ করা জায়েয। অর্থাৎ নিজের নুৎফায় পয়দা হওয়া জারজ কন্যার সাথে বিবাহ করা জায়েয। (উরফুল জাদি)

১১) নাপাক অবস্থায় নামায পড়া যাবে। নামায পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। (বদরুল আহিল্লাহ, পৃষ্ঠা-৩৮)

১২) আহলে হাদিসদের মতে হস্তমৈথুন করা জায়েয (উরফুল জাদি)

১৩) কোন ওজর ব্যতীত নাপাক কাপড়ে নামায পড়া যাবে। (দলীলুত ত্বালিব, পৃষ্ঠা-২৬৪

১৪) ফরজ গোসল না করে নাপাক অবস্থায় কোরআন স্পর্শ করা যাবে। (দ্বলীলুত ত্বালিব, পৃষ্ঠা-৬৭)

১৫) আল্লাহর নামে যিকর করা বিদআত। (আল বুনইয়ানুল মরসুম, পৃষ্ঠা-১৭৩)

১৬) রমযান মাসে ইচ্ছা করে পানাহার করলে কাফ্ফারা দিতে হবে না। (দসতুরুল মুত্তাকী, পৃষ্ঠা-২০৭)

১৭) ব্যবসার মালে জাকাত নেই। (বদরুল আহিল্লাহ, পৃষ্ঠা-১০২)

১৮) পানিতে নাপাক পড়লে পানি নাপাক হয় না। (উরফুল জাদি, পৃষ্ঠা-৯)

১৯) সোনা ও রূপোর অলঙ্কারে জাকাত নেই। (বদরুল আহিল্লাহ, পৃষ্ঠা-১০১)

২০) সোনা ও রূপোর অলঙ্কারে যাকাত নেই। (দ্বলিলুত ত্বালিব, পৃষ্ঠা-৪৩৩)

২১) যদি লজ্জাস্থানের মধ্যে লাঠি প্রবেশ করানো হয় এবং যদি শুকনো বেরিয়ে আসে, তাহলে অজু ভঙ্গ হয় না। (নজলুল আবরার, ১ম খণ্ড, পৃঃ- ২০)

২২) যদি লোহা অথবা অন্য কোন জিনিসের লিঙ্গ তৈরী করে লজ্জাস্থানে প্রবেশ করানো হয়, আর যদি শুকনো বেরিয়ে আসে, তাহলে অজু ভঙ্গ হয় না। (নজলুল আবরার, ১ম খণ্ড, পৃঃ- ২০)

২৩) জানোয়ারের লজ্জাস্থানে যদি কেউ সহবাস করে, তাহলে গোসল করা ফরজ হবে না। (নজলুল আবরার, ১ম খণ্ড, পৃঃ- ২৩)

২৪) পুরুষের পায়ুপথে সহবাস করলে গোসল করা ফরজ হবে না। (নজলুল আবরার, ১ম খণ্ড, পৃঃ- ২৩)

২৫) প্রত্যেক হালাল ও হারাম জানোয়ারের পেচ্ছাব পবিত্র। (নজলুল আবরার, ১ম খণ্ড, পৃঃ- ৪৯)

২৬) ইমাম নামাজ পড়ানোর পরে যদি বলে, আমি অজুহীন ছিলাম, আর মুক্তাদী যদি নামাজ না দোহরায়, তাহলে (সকল মুক্তাদীর) নামাজ হয়ে যাবে। (নজলুল আবরার, ১ম খণ্ড, পৃঃ- ১০১)

২৭) কোন ব্যক্তি একজন মহিলার সঙ্গে জ্বেনা করল, সেই মহিলার মা এবং কন্যা তার জন্য (বিবাহ করা) হালাল। (নজলুল আবরার, ১ম খণ্ড, পৃঃ- ২১)

২৮) পুত্র যদি কোন মহিলার সঙ্গে জ্বেনা করে, তাহলে তার পিতার জন্য সেই ম হিলা (বিবাহ করা) হালাল। (নজলুল আবরার, ২য় খণ্ড, পৃঃ- ২১)

২৯) সাত বছরের বালিকা যদি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সঙ্গে সহবাস করায়, তাহলে সেটা হারাম বলে প্রমানিত হবে না। (নজলুল আবরার, ২য় খণ্ড, পৃঃ- ২১)

৩০) হেজাজের ফেকাহতে ‘মুতা’ করা জায়েজ। (নজলুল আবরার, ২য় খণ্ড, পৃঃ- ৩৫/ তথ্যসূত্র ঃ মুতালায়ে গায়ের মুকাল্লিদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃঃ- ৩২০-৩৩৬, লেখক- মুহাম্মাদ আমীন সফদর ওকাড়বী রহঃ)

এই হল গায়ের মুকাল্লিদ আহলে হাদিস দলের তথাকথিত নামধারী মৌলবীদের জঘন্যতম ফতোয়া। যা পাঠ করলেই বমি আসে, ঘৃণাবোধ হয়। এগুলো কোরআন ও সহীহ হাদিস তো দূরের কথা যইফ বা মওযু হাদিসেও এসবের কোন নামপাত্তা পাওয়া যায় না। যাদের মশলার কিতাবে এত জঘন্য ফতোয়া বিদ্যমান তারা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মজহাবের বিরোধিতা করে। এবং তারা কোন মুখে বলে, “হানাফীদের দলীল যইফ, মওযু ইত্যাদি আর আমাদের দলীল মজবুত।” সত্যই ভাবলে অবাক লাগে।

কোর্আনও কি এক ধরণের হাদিস ?

প্রশ্ন নং ৮ ঃ আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে, কোরআন ও হাদিস একই জিনিস। কেননা কোরআন শরীফে কোরআনকে হাদিস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে বলেছেন, “আল্লাহু নাযযালা আহসানাল হাদিস।” অর্থাৎ আল্লাহ অতি উত্তম হাদিস (কোরআন)অবতীর্ণ করেছেন। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা কোরআন মজিদকে উত্তম হাদিস বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং আমরা (আহলে হাদিসরা) কোরআন ও হাদিস উভয়কে মেনে আহলে হাদিস হয়ে হকপন্থী হব না কেন ?

উত্তর ঃ উত্তরে এখানে বলব, আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোকেরা কোরআন শরীফের উক্ত আয়াত দ্বারা মুসলমানদের সামনে চূড়ান্ত ধাপ্পাবাজির পরিচয় দিয়েছেন। পৃথিবীর কোন তাফসীর গ্রন্থে উক্ত আয়াতের তফসিরে কোন মুফাসসির কোরআন শরীফকে হাদিস বলে উল্লেখ করেন নি।

বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন' নামক তাফসীর গ্রন্থটি বর্তমান বিশ্বের ইসলামী প্রাণকেন্দ্র মক্কা মুআজ্জমা থেকে সউদি বাদশাহ বাংলা অনুবাদ করে বাদশাহী খরছে ছাপিয়ে হাজী সাহেব দিগকে হজ্জের মৌসুমে ফ্রি বিতরণ করেন। উক্ত তফসীর গ্রন্থটি বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রশংসিত ও প্রসিদ্ধ। সেই বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে কোরআন শরীফের উক্ত আয়াতের অনুবাদে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ আআলা অবতীর্ণ করেছেন উত্তম কথা।' কোরআন শরীফের আরবী 'আহসানাল হাদিস' শব্দের বাংলা অনুবাদ করা হলে 'উত্তম কথা'। পৃথিবীর কোন তাফসীর গ্রন্থে 'আহসানাল হাদিস' শব্দের অনুবাদ করে কুরআন শরীফকে হাদিশ গ্রন্থ বলা হয়নি বা 'উত্তম হাদিস' বলা হয়নি।

আমার কাছে যে বঙ্গানুবাদ সহ বুখারী শরীফ আছে তা বাংলাদেশ থেকে 'সোলেমানিয়া বুক হাউস' থেকে ছাপা। এর বাংলা অনুবাদ করেছেন শাইখুল হাদিস মাওলানা মোহাম্মদ আজীজুল হক সাহেব। এর 'হাদিসের পরিচয়' অধ্যায়ে লেখা আছে, ''হাদিস শব্দের শাব্দিক অর্থ কথাবার্তা নতুন কিছু যা পূর্বে ছিল না। আর ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কথাবার্তা, ক্রিয়াকলাপ এবং প্রত্যক্ষ পরোক্ষ মৌন সম্মতিকে হাদিস বলা হয়।''(পৃষ্ঠা-৩)

এখানে পরিস্কার বলা হয়েছে হাদিস শব্দের শাব্দিক অর্থ কথাবার্তা নতুন কিছু, যা পূর্বে ছিল না। এখানে আমার প্রশ্ন কোরআন কি নতুন কিছু ? কোরআন কি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর জন্মের পূর্বে ছিল না ?

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহপাক সুরা ত্বাহা ও সুরা ইয়াসীনকে আসমান ও জমীন সৃষ্টির এক হাজার বৎসর পূর্বে পড়েছিলেন, যা শুনে ফেরেস্তারা বলেছিল, কত বড় সৌভাগ্য ঐ উম্মতের যাদের উপর এই কোরআন অবতীর্ণ হবে এবং সৌভাগ্যবান ঐ অন্তর যার মধ্যে তা থাকবে। আর কতই না তৃপ্ত হবে ঐ জিহ্বা যে তাকে তিলাওয়াত করবে। (মিশকাত শরীফের শারাহ 'মাজাহিরে হক্ব')

এই হাদিস থেকে পরিস্কার প্রমাণিত আসমান ও জমীন সৃষ্টির এক হাজার বছর পূর্ব থেকেই সুরা ত্ব-হা ও সুরা ইয়াসীন অর্থাৎ কোরআন শরীফ মওজুদ ছিল। আর আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের কথা অনুযায়ী কোরআনকে যদি হাদিস বলা হয় তাহলে একথা বলতেই হবে হাদিস শব্দের সংজ্ঞা অনুযায়ী কোরআন শরীফ নতুন কিছু যা পূর্বে ছিল না।

এখন আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি এসে এঁড়ে হুজ্জতির উপস্থাপন করে বলেন, কোরআনই হল 'উত্তম হাদিস'। তাহলে মিশকাত শরীফের শারাহ গ্রন্থ 'মাজাহিরে হক্ব' গ্রন্থে যে হাদিসে বর্ণিত আছে, 'আল্লাহ পাক আল্লাহপাক সুরা ত্বা-হা ও সুরা ইয়াসীন অর্থাৎ কোরআন শরীফ আসমান ও জমীন সৃষ্টির এক হাজার বছর পূর্বে পড়েছিলেন" এই হাদিসটি কোথায় ফেলবেন ? নর্দমায় না কুঁয়োর জলে ?

আর কোরআন শরীফকে ‘হাদিস’ বলে উল্লেখ করলে ‘মাজাহিরে হক্ক’ গ্রন্থের উক্ত হাদিসটি অস্বীকার করা হল কি হল না ? আমরা সকলেই জানি আহলে কোরআন দলের লোকেরা কোরানের সহযোগিতা নিয়ে কোরআনকে অস্বীকার করে এবং আহলে হাদিস দলের লোকেরা হাদিসের সহযোগিতা নিয়ে হাদিসকে অস্বীকার করে।

আগেই বলেছি, ‘ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বার্তা, ক্রিয়াকলাপ এবং প্রত্যক্ষ পরোক্ষ মৌন সম্মতিকে হাদিস বলা হয়।’ (দেখুন বাংলাদেশ থেকে ছাপা বুখারী শরীফের হাদিসের পরিচয় অধ্যায়ে)

তাহলে আহলে হাদিসদের কথা অনুযায়ী কোরআনকে উত্তম হাদিস বললে কোরআন শরীফকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কথাবার্তা, ক্রিয়াকলাপ এবং প্রত্যক্ষ পরোক্ষ মৌন সম্মতি বলে কোরআনকে নবীর বাণী বলে উল্লেখ করা হল কি হল না?

মুসলমানদের জঘন্যতম শত্রু ইহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা কোরানকে আল্লাহর বাণী না বলে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর বানী বলে প্রচার করে। আর আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোকেরা কোরআনকে ‘উত্তম হাদিস’ বলে অভিহিত করে কোর আনকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর বাণী বলে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের প্রচারে মন দিয়েছেন একথা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

আমাদের আহলে সুন্নতুল জামাআতের প্রত্যেক মুসলমানের আকিদা হল, আল্লাহ যেমন মখলুক নন ঠিক তেমনি আল্লাহর বাণী মহাগ্রন্থ কোরআনও মখলুক (সৃষ্টি)

নয়, আর নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন মখলুক তেমনি তাঁর হাদিসও মখলুক। আর মুতাজিলা পন্থীদের আকীদা হল আল্লাহর কোরআনও মখলুক। অহলে আহলে হাদিসদের কথা অনুযায়ী কোরআনকে যদি ‘উত্তম হাদিস’ বলা হয় তাহলে কোর আনকে নবী (সাঃ) এর বাণী বলে কোরআনকে মখলুক বলে আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোকেরা মুতাজিলাদের অন্তর্ভুক্ত হলেন কি না ?

পরিশেষে একটি কথায় বলতে চাই, এখনও যদি আহলে হাদিস দলের লোকেরা কোরআন মজীদকে ‘উত্তম হাদিস’ বলে মানেন তাহলে এখানে আমরা বলব, প্রত্যেক মুসলমান মাত্রই জানেন হাদিসের মধ্যে বহু প্রকারভেদ আছে, যেমন সহীহ হাদিস, যইফ হাদিস, মওযু হাদিস, নাসেক হাদিস, মনসুখ হাদিস মরফু হাদিস, মক্বতু হাদিস, হাসান হাদিস, মুরসাল হাদিস প্রভৃতি। আর কোরআন যদি হাদিস হয় তাহলে কোরআন কি হাদিস ? সহীহ হাদিস, না জইফ হাদিস, না মওযু হাদিস, না নাসেক হাদিস না মনসুখ হাদিস, না মরফু হাদিস, না মক্বতু হাদিস, না হাসান হাদিস না মুরসাল হাদিস ? তাহলে কুরআনও কি এত প্রকার আছে বা মওজু আছে ?

এখানে আমরা আরও প্রশ্ন করতে পারি, কোরআন শরীফের প্রত্যেকটি আয়াত যদি এক একটি করে হাদিস হয়, তাহলে হাদিসের মধ্যে সনদ থাকে এবং সনদের মধ্যে বিভিন্ন রাবী থাকে। তাহলে আহলে হাদিসদের কথা অনুযায়ী কোরআন নামক হাদিসের সনদের রাবী কে কে রয়েছে অর্থাৎ সেই রাবীগুলোর নাম কি ? সেই সনদগুলিকে কোন কোন মুহাদ্দিস সহীহ বলেছেন, কোন মুহাদ্দিস যইফ বলেছেন কোন মুহাদ্দিস মওযু বলেছেন, কোন মুহাদ্দিস নাসেখ বলেছেন, কোন মুহাদ্দিস মনসুখ বলেছেন, কোন মুহাদ্দিস মরফু বলেছেন, কোন মুহাদ্দিস মুরসাল বলেছেন ?

৩০ পারা কোরআন শরীফের ১১৪ টা সুরা এবং ৬৬৬৬টা আয়াত রয়েছে। প্রত্যেকটি আয়াত আমাদেরকে সনদ সহকারে জানাতেই হবে। ভাঙা ঢোলে বাড়ি মারলে আমরা শুনব না।

দলীল না জেনে তকলিদ করা হয় কেন ?

প্রশ্ন নং ৯ ঃ আহলে হাদিস দলের লোকেরা বলেন, মুজতাহিদ ইমামগণের ততক্ষণ অনুসরণ করা যাবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের কথার স্বপক্ষে কোরআন হাদিস থেকে দলীল না পাওয়া যাবে। আর মুকাল্লিদরা দলীল না জেনে ইমামগণের তকলিদ করে কেন?

উত্তর ঃ সাধারণ মানুষ ও সাধারণ উলামার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয় মুজতাহিদ ইমামগণের বাণীসমূহ এবং তাঁদের ইজতেহাদকৃত মাসআলা মাসায়েল কোরআন ও হাদিসের কষ্টি পাথরে যাঁচাই করতে পারেন। তাহলে তারা কি নামাজ-রোজা বন্ধ করবে ? তারা হয় হানাফী আলেমের তকলিদে নামাজ পড়বে, না হয় আহলে হাদিশ আলেমের। সর্ব বিষয়ে অনুসন্ধান করার যোগ্যতা তো সকলের নেই। তারা কি কারো তকলিদ না করে নামাজ-রোজা না করেই মরবে ? আর যারা সাধারণ মানুষ তারা কোরআন ও হাদিসের প্রমাণাদি নিয়ে গবেষণা করতে অক্ষম। তাদের জন্য বিনা দালিলে তকলীদ ছাড়া কোন গতি নেই। আর মুজতাহিদদের ইস্তেম্বাতকৃত সমস্ত মাসা আলা মাসায়েলের দলীল অনুসন্ধান করাও সব মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মুজতাহিদ ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে দলীল অনুসন্ধান করা সম্ভব নয় তার মানে এই নয় আমাদের আলেম উলামাদের কাছে সমস্ত মাসআলা মাসায়েলের কোন দলীল নেই।

আলেম উলামাদের কাছে এর দলীল অবশ্যই আছে। ইমামের স্বপক্ষে কুরআন-হাদিশের দলিল না পাওয়া গেলে আমল করা যাবে না। প্রশ্ন হল, এই ১৪০০ বছরেও কি তা যাঁচাই হয়নি, যা ১৪০০ বছর পর যাঁচাই করার জন্য আল্লাহ কি আহলে হাদিশদেরকে ভুঁইফোড় মুজতাহিদ করে পাঠিয়েছেন ? মুতাজিলাদের মত তকলিদী ইমাম গ্রহনযোগ্য নয়, মূল কথা মুজতাহিদের উপর আস্থা রাখতে হবে নতুবা সকলে আমল করতে পারবে না।

যেমন মনে করুন, কোন লোক যদি রোগের চিকিৎসা করানোর জন্য চিকিৎসকের কাছে যায় এবং উক্ত লোক যদি চিকিৎসকের কাছে সমস্ত ওষুধের দলীল অনুসন্ধান না করে ওষুধ সেবন না করে তাহলে লোকটি বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে। একজন সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা সমাজের বড় বড় বুদ্ধিজীবিরাও যদি ওষুধ কি কি উপাদান দিয়ে তৈরী তার দলীল অনুসন্ধান করতে সহজে পারবে না। এখন যদি কেউ মনে করে ওষুধ কি কি উপাদান দিয়ে তৈরী হয়েছে তার দলিল অনুসন্ধান না করে ওষুধ সেবন করা যাবে না। তাহলে তার মত মুর্খ ব্যক্তি আর হয় না। এবং সেই লোকটি উক্ত ভাবধারার দরুণ জীবনে কোনদিন ওষুধ সেবন করতে পারবে না এবং বিনা চিকিৎসায় সে বেমত মারা যাবে। আর সব থেকে বড় কথা হল কোন চিকিৎসক যখন চেম্বারে বসেন তখন তাঁর কাছ থেকে সমাজের বড় বড় সাংবাদিক, সাহিত্যিক, মন্ত্রী, শিক্ষকরা ওষুধ নেওয়ার সময় কোন দলীল অনুসন্ধান না করে চোখ বন্ধ করে ভরসা করে ওষুধ সেবন করেন এবং উপকৃত হন।

ঠিক সেই রকম কোন মানুষ যদি মুজতাহিদদের প্রতিটি মাসআলার দলীল তলব না করে আমল না করে তাহলে সে জীবনে কোনোদিন ইসলামী হুকুম ও আহকামের

উপর আমল করতে পারবে না। কেননা মুজতাহিদরা কোন মাসআলা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন তা জানা সাধারণ মানুষের পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব নয়।

আর দলীল না জেনে শরীয়াতের মাসআলা মাসায়েলের উপর আমল করা যাবে না, এ হল মুতাযিলা সম্প্রদায়ের আকীদা। আল্লামা খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন, "কিছু মুতাযিলা থেকে বর্ণিত যে, 'তাদের মতে' সাধারণ মানুষের জন্য মাস আলার দলীল না জানা পর্যন্ত আলিমের (ও মুজতাহিদের) কথার উপর আমল করা জায়েজ নয়; এটা তাদের ভূল ধারণা। কেননা, সাধারণ মানুষের বোঝার কোন উপায় নেই।" (ফকীহ অ মুতাফাক্কিহ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা--৬৯)

আমি এর আগেও প্রমাণ করে দিয়েছি কোরআনকে হাদিস বললে কোরআনকে ম খলুক বলা হয়। আর কোরআনকে মখলুক বলা হল মুতাযিলা সম্প্রদায়ের আকিদা। আর এখানে আল্লামা খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) কথা অনুযায়ী সাধারণ মানুষের জন্য মাস আলার দলীল না জানা পর্যন্ত আলিমের (ও মুজতাহিদদের) কথার উপর আমল করা জায়েজ নয়' এও হল মুতাযিলা সম্প্রদায়ের আকিদা। তাহলে উপরিউক্ত দুইটি প্রমাণ অনুযায়ী আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোকেরা মুতাযিলা পন্থীদের অন্তর্ভুক্ত হলেন কি না ?

আর বড় পীর আব্দুল তাদের জিলানী (রহঃ) তাঁর 'গুনিয়াতুত ত্বালেবীন' কিতাবের ১২৯ ও ১৩০ পৃষ্ঠায় মুতাযিলা সম্প্রদায়কে ৭২ ফিরকার অন্তর্ভুক্ত করে জাহান্নামী দল বলে বর্ণনা করেছেন। তাহলে বড়পীর আব্দুল কাদের জিলামী (রহঃ) এর কথা অনুযায়ী আহলে হাদিস দলের লোকেরা জাহান্নামী হলেন কি না ?

পরিশেষে বলতে চাই, বিনা দলীল জেনে মুজতাহিদ আলীমদের তকলীদ করা জায়েজ আছে। যেমন আল্লামা ইবনে কায়্যিম (রহঃ) লিখেছেন, "(দলীল না জেনে) তকলীদ করে ফতোয়া প্রদান বৈধ কি ? এ বিষয়ে তৃতীয় রায়, মুজতাহিদ আলিম না হলে প্রয়োজনের সময় এটা জায়েজ আছে। এটাই বিশুদ্ধতম মত এবং এর উপরই আমল হয়।" (আলামুল মুওয়াক্কিয়ীন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা--৩৬)

সুতরাং আল্লামা ইবনে কায়্যিম (রহঃ) এর ফতোয়া অনুযায়ী দলীল না জেনে তকলিদ করা জায়েজ আছে।

অনুরূপভাবে ইসলামের বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ, যেমন আল্লামা ইবনে হাজার আস্কালানী (রহঃ), ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম মুসলিম (রহঃ) প্রভৃতিরা বিনা দলীলে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর তাকলীদ করেছেন। আল্লামা ইবনে মুবারক (রহঃ) শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) প্রভৃতিরা বিনা দলীলে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর তকলীদ করেছেন, আল্লামা ইবনে আব্দুল বার মালেকী (রহঃ) ইমাম মালেক (রহঃ) এর তকলীদ করেছেন, ইমাম বাইহাকী (রহঃ) ইমাম মালেক (রহঃ) এর তকলীদ করেছেন, ইমাম বাইহাকী (রহঃ) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) তকলীদ করেছেন এবং উপকৃত হয়েছেন।

ইমাম আবু হানিফার সাথে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে মতবিরোধ কেন ?

প্রশ্ন নং ১০ ঃ আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোকেরা অভিযোগ করে প্রশ্ন করেন। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম সুফার প্রভৃতি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর ছাত্ররা শতকরা ষাট ভাগ মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর সাথে তাঁর ছাত্রদের এত মতবিরোধ কেন ?

উত্তর ঃ এর উত্তর আল্লামা শামী (রহঃ) দিয়েছেন, তিনি লিখেছেন বিরোধিতা করেছেন এবং গ্রহণযোগ্য মাশাইখগণ সেগুলিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সে মাসাইলগুলি ইমাম আবু হানিফার মজহাব বহির্ভূত নয়। তদ্রুপ পরবর্তী মাশাইখেরা যুগ পরিবর্তন বা কোন প্রয়োজন ইত্যাদির খাতিরে পরিবেশ সাপেক্ষে যা কিছু বলেছেন, সেগুলিও ম জহাবের বাইরে নয়।.......এই জন্য যে, ইমাম আবু হানিফা যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি ঐ কথা-ই বলতেন, যা মাশাইখরা বলেছেন। উপরন্তু সব কিছু তো তাঁর উসুলের ভিত্তিতে।” (শরহু উকুদি রসমিল মুফতী, পৃষ্ঠা--৬৫-৬৬)

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন,

“হানাফী মজহাবের উপর আমলের পদ্ধতি এই যে, মাসআলা সম্পর্কে (ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ এই) তিন ইমামের রায়ের মধ্য থেকে যেটা নবী (সাঃ) এর তরীকার বেশী নিকটবর্তী সেটা ধরা হবে। অতঃপর ঐ সমস্ত হানাফী ফকীহ গণের পছন্দনীয় রায় অনুসরণ করা হবে, যারা হাদিস শাস্ত্রবিদ। (তিন

ইমাম ও পরবর্তী ফকীহগণের রায়) এ সবগুলি হানাফী মজহাব। (ফুয়ুজুল হারামাইন, পৃষ্ঠা-৪৮)

সুতরাং আহলে হাদিসেরা হানাফী মজহাবের প্রকৃত স্বরূপ না জানার কারণে উক্ত প্রশ্ন করেন। তাঁরা হানাফী মজহাবের প্রকৃত স্বরূপ যদি জানতেন তাহলে এরকম ধরণের প্রশ্ন করতেন না। আসলে ইমাম আবু হানিফার সাথে তাঁর ছাত্ররা যে ম তবিরোধ করেছেন যদি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) তাঁদের অর্থাৎ ছাত্রদের যুগে বেঁচে থাকতেন তাহলে অবশ্যই তিনি সেই কথায় বলতেন যে কথা তাঁর ছাত্ররা বলেছেন। কেননা যুগের পরিবর্তনে শরীয়াতের হুকুম বদলে যায়। যেমন, হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে,

হজরত সাহেব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, হুজুর (সাঃ) এর যামানা থেকে নিয়ে হজরত উমারের খিলাফত কালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত মদ্যপায়ীকে ৪০ চাবুক মারা হত। শেষে যখন মানুষেরা মদ্যপানে অবাধ্য হয়ে সীমা লঙ্ঘন করলে তখন হজরত উমার (রাঃ) ৮০ চাবুক লাগাতেন। (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-১০০২)

এখানে হজরত উমার (রঃ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ৪০ চাবুক মারাকে বাদ দিয়ে ৮০ চাবুক মারতে শুরু করে দিলেন। যুগের চাহিদা ভিত্তিক এটা করা তাঁর প্রয়োজন ছিল। কেননা তাঁর যুগে মানুষেরা মদ্যপানে অবাধ্য হয়ে সীমা অতিক্রম করেছিল। আর মুসলিম শরীফের হাদিসে বর্ণিত আছে, হজরত আলী (রাঃ) উমার (রাঃ) এর উক্ত কর্মকে সুন্নত বলেছেন তিনি বলেছেন, ৪০ চাবুক ও ৮০ চাবুক উভয়ই সুন্নত। আর আমাদের বিশ্বাস রসুলুল্লাহ(সাঃ) যদি উমার(রাঃ) এর জামানায় বেঁচে থাকতেন তাহলে

তিনি অবশ্যই উমার (রাঃ) এর উক্ত কর্মকে স্বীকৃতি দিতেন। কেননা, সাহাবায়ে কেরামরাই রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সম্পর্কে বেশী ওয়াকীবহাল ছিলেন।

অনুরূপভাবে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর ছাত্ররা যেসব মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর বিরোধিতা করেছেন। যদি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) তাঁর ছাত্রদের যুগে বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনিও তাঁদেরকে স্বীকৃতি দিতেন, কেননা যুগের পরিবর্তনে শরীয়াতের হুকুম বদলে যায়। যেমন, হানাফী মজহাবের সমস্ত ফেকাহ গ্রন্থে লেখা আছে, ছবি তোলা হারাম। কিন্তু বর্তমানে হজ্জ করতে গেলে পাসপোর্ট করার জন্য ছবি লাগবেই। সেজন্য হানাফী মজহাবের সমস্ত মুফতীরা এখন ছবি তোলাকে প্রয়োজনের খাতিরে জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এখন যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনিও বর্তমানে ছবি তোলাকে প্রয়োজনের খাতিরে জায়েজ বলে ফতোয়া দিতেন। কেননা যুগের পরিবর্তনে শরীয়তের হুকুমও বদলে যায়। আর একান্তই যদি ইমাম আবু হানিফার সাথে তাঁর ছাত্রবর্গের (ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম জুফার) সাথে মতবিরোধ মারাত্মক পর্যায়ের হয় তাহলে যে মাসআলাটি নবী করীম (সাঃ) এর তরীকার বেশী নিকটবর্তী হবে সেটা ধরা হবে। কেননা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) আমাদের ইমাম হলেও তিনি মাসুম বা নিষ্পাপ ছিলেন না। এবং তিনি সমস্ত ভুল ভ্রান্তির উর্দ্ধেও ছিলেন না। যদি তাঁর ইজতেহাদকৃত মাসআলা নবী করীম (সাঃ) এর তরীকার বেশী নিকটবর্তী না হয় তাহলে তাঁর ছাত্রদের ইজতেহাদকৃত মাসআলা গ্রহণযোগ্য হবে।

এখানে অনেকে অভিযোগ করতে পারেন, হানাফীদের যদি একজন ইমামের মুকাল্লিদ হন অর্থাৎ হানাফীরা যদি কেবলমাত্র ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)

এরই তকলীদ করেন তাহলে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কে ছেড়ে দিয়ে তাঁর ছাত্রদের তকলীদ করছেন কেন ? আর এখানে তাকলীদে **শাখশীই** বা নির্দিষ্ট একজন ইমামেরই তাকলীদ জারী থাকে কি করে ?

এই অভিযোগটি তকলীদে **শাখশীর**'র প্রকৃত স্বরূপ না জানার পরিণাম। মনে রাখা দরকার যে, '**শাখশ**'(ব্যক্তি) দু'প্রকার (ক) **শখশ** হাকীকী Real Person (প্রকৃত একজন)। (খ) **শখশ** হুকমী Legal Person (আইনত একজন)। অর্থাৎ নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি (Point of view) অনুসরণ করার নাম 'তকলীদে **শখশী**'। এক্ষেত্রে এটাই উদ্দেশ্য। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর ছাত্রবর্গের বা হানাফী মজহাবের পরবর্তী ফকীহগণের রায় অনুসরণ করাটাও পরোক্ষে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর তকলীদ। কারণ এঁরা সকলেই তাঁর উসুল ও দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী। (ইমাম মানব কেন ? পৃষ্ঠা --৫৫)

এর পরেও যদি কোন গায়ের মুকাল্লিদ এঁড়ে হুজ্জুতির উপস্থাপন করে বলে, এসব যুক্তি আমরা মানি না। ইমাম আবু হানিফা কেমন উস্তাদ ছিলেন যে তাঁর কথা তাঁর ছাত্ররাই মানতেন না। তিনি যদি সত্যই বড় মুজতাহিদ হতেন তাহলে তাঁর ছাত্ররাও তাঁর কথা মানতেন, তাঁর ছাত্ররাই যখন তাঁর কথা মানে নি তাহলে আমরা কেন মানব?

এখানে উত্তরে আমি বলব, সৌভাগ্য হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সুলাইমান (আঃ) এর যে তাঁদের যুগে কোন গায়ের মুকাল্লিদ ছিল না। থাকলে তখনকার যুগের লোকেরা হযরত দাউদ (আঃ) এর নবুয়তকে অস্বীকার করে বসত।

যেমন মুফাসসিরিনে কেরামরা একটা ঘটনা লিখেছেন যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) এর যুগে একটি লোক মাঠে ফসল লাগিয়েছিল। অন্য একজন লোক মাঠের ধারে ছাগল চরাচ্ছিল। সেই ছাগলওয়ালার ছাগলগুলি ফসলওয়ার মাঠে নেমে মাঠের ফসলগুলি নষ্ট করে দিয়েছিল। তখন ফসলওয়ালা হযরত দাউদ (আঃ) এর কাছে এসে অভিযোগ করল। হযরত দাউদ (আঃ) বিচার করে ফায়সালা করে ছাগলওয়ালাকে বললেন, তুমি ভুল কাজ করেছ। তোমার ছাগল এই ব্যক্তির ফসল নষ্ট করেছে। তোমার ছাগল এক হাজার টাকার ফসল নষ্ট করেছে অতএব তুমি এক হাজার টাকা মূল্যের ছাগল এই ব্যক্তিকে দিয়ে দাও। তখন দাউদ (আঃ) বিচার দুই ব্যক্তির পছন্দ হল না তারা হরত দাউদ(আঃ) এর পুত্র হযরত সুলাইমান (আঃ) এর কাছে গিয়ে বিচার চাইল। তাদের অভিযোগ শুনে হযরত সুলাইমান (আঃ) বিচার করে বললেন তোমরা এক কাজ কর, যার ফসল নষ্ট হয়েছে তার পুরো মাঠটি ছাগলওয়ালাকে দিয়ে দাও। এই ব্যক্তি চাষ করবে এবং চাষ করে ফসল নষ্ট হওয়ার পূর্বে যেমন ফসল ছিল ঠিক তেমনি করবে। আর ফসল ওয়ালা ব্যক্তি এর ছাগলগুলো নিয়ে নাও। তুমি এর ছাগলের দুধ পান করবে এবং নিজেদের সন্তানদেরও দুধ পান করাবে। যখন জমির ফসল পূর্বের মত হয়ে যাবে তখন তোমরা জমি ও ছাগল একে অপরকে ফেরত দিয়ে দেবে।

এই ঘটনার দ্বারা বোঝা যায় হযরত দাউদ (আঃ) এক বিচার এক রকম ছিল আর হযরত সুলাইমান (আঃ) এর বিচার আর এক রকম ছিল। কোরআন শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) এর বিচার সঠিক ছিল।

এখানে আমি বলব, সৌভাগ্য হযরত দাউদ (আঃ) এর যে তাঁর যুগে কোনো গায়ের মুকাল্লিদ ছিল না। থাকলে তারা হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কে বলত, "হযরত দাউদ (আঃ) কেমন নবী ছিলেন যে তাঁর বিচার তাঁর পুত্রই মানে না। তিনি যদি সত্যই নবী হতেন তাহলে তাঁর পুত্রও তাঁর বিচার মানতেন, তাঁর পুত্রই যখন তাঁর বিচার মানে নি তাহলে আমরা কেন মানব ?"

এখানে উল্লেখ্য যে হযরত সুলাইমান (আঃ) হযরত দাউদ (আঃ) এর পুত্র ছিলেন।

মুহাদ্দিসিনে কেরামরা আরও একটা আশ্চর্য্যজনক ঘটনা লিখেছেন যে একটি বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে দুটি মহিলা ঝগড়া করছিল। বড় মহিলাটি বলছিল, ছেলেটি আমার এবং ছোট মহিলাটি বলছিল ছেলেটি আমার। ঝগড়া যখন সাংঘাতিক পর্যায়ে পৌঁছে গেল তখন তাঁরা হযরত দাউদ (আঃ) এর কাছে বিচারের জন্য স্মরণাপন্ন হল। হযরত দাউদ (আঃ) দুজনের যুক্তি শুনে শেষে বড় মহিলাটির স্বপক্ষে বিচার করে বাচ্চাটিকে বড় মহিলাটিকে দিয়ে দিলেন। তখন ছোট মহিলাটি বললেন হযরত সুলাইমান (আঃ) ও আল্লাহর নবী। তাঁর কাছে গিয়েও বিচার চাইলে ভাল হয়। তখন দুইজন মহিলা হযরত সুলাইমান(আঃ) এর স্মরণাপন্ন হল। তখন হযরত সুলাইমান (আঃ) দুইজনের যুক্তি শুনে বললেন, একটি ছুটি নিয়ে এসো বাচ্চাটিকে দুই টুকরো করে দুইজনকে দিয়ে দিই। তাই একটি ছুরি নিয়ে বাচ্চাটিকে কাটতে গেলেন। তখন বড় মহিলাটি হযরত সুলাইমান (আঃ) এর বিচার মেনে নিল। কিন্তু ছোট মহিলাটি বাচ্চাটি মারা যাওয়ার ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, পুরো ছেলেটাকেই বড় মহিলাকে দিয়ে দেন। তখন হযরত সুলাইমান (আঃ) ছেলেটিকে ছোট মহিলাকেই দিয়ে দিলেন। কেননা ছোট মহিলাটাই ছেলেটির আসল মা বলেই ছেলেটাকে হত্যা করা দেখতে পারলেন না।

এখানে দেখা গেল, হযরত দাউদ (আঃ) এর বিচার এক রকম ছিল আর হযরত সুলাইমান (আঃ) এর বিচার আর এক রকম ছিল।

এখানে আমি বলব সৌভাগ্য হযরত দাউদ (আঃ) এর যে তাঁর যুগে কোনো গায়ের মুকাল্লিদ ছিল না। থাকলে তারা বড়ই হট্টগোল বাঁধিয়ে দিত এবং হযরত দাউদ (আঃ) এর নবুয়তকে অস্বীকার করে বলত, "হযরত দাউদ (আঃ) কেমন নবী ছিলেন যে তাঁর বিচার তাঁর পুত্রই মানে না। তিনি যদি সত্যিই নবী হতেন তাহলে তাঁর পুত্রও তাঁর বিচার মানতেন। তাঁর পুত্রই যখন তাঁর বিচার মানে নি তাহলে আমরা কেন মানব?" কি বুঝলেন ?

কেবলমাত্র চার ইমামের তকলিদ কেন ?

প্রশ্ন নং ১১ ঃ আহলে হাদিস দলের লোকেরা প্রশ্ন করেন, চার ইমামের আগে যে সব ইমাম অর্থাৎ মুজতাহিদ পৃথিবীতে এসেছিলেন তাদের তাকলীদ করা হয় না কেন ? কেবলমাত্র চার ইমামের আগে যেসব মুজতাহিদ এসেছিলেন তাদের তাকলীদ এখন জায়েজ না জায়েজ নয় ?

উত্তর ঃ কেবলমাত্র চার মজহাবেরই তকলীদ ওয়াজীব হওয়ার কারণ, কেবলমাত্র চার মাজহাবের ফিকাহগ্রন্থ এবং চার ইমামেরই ইজতেহাদকৃত মাসআলা মাসায়েলই সংকলিত ও সংরক্ষিত। এই চার মুজতাহিদ ইমাম ছাড়া কোন মুজতাহিদের ফিকাহ বা ইস্তেম্বাতকৃত মাসআলা মাসায়েল বিস্তারিত ও বিশুদ্ধ সূত্রে সংকলিত ও সংরক্ষিত

নেই। যদি অন্যান্য মুজতাহিদগণের মজহাব বা ফিকাহ চার ইমামের মত সংকলিত ও সংরক্ষিত হত, তাহলে অবশ্য তাঁদেরও তকলীদ করা হত। এবং তাঁদের মজহারের কোন বিস্তারিত গ্রন্থাদি ও আলেম উলামা না থাকার জন্য তাঁদের তকলীদ করা সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার হজরত ইমাম নববী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন, "সাহাবায়ে কিরাম ও প্রথম যুগের মনীষীরা যদিও পরবর্তী ইমামগণ অপেক্ষা জ্ঞানে গুণে এগিয়ে কিন্তু তাঁরা নিজেদের বিধি বিধান ও ফতওয়া সংকলন করে ইলম সংরক্ষণের সুযোগ পাননি। তাই কোন ব্যক্তির জন্য তাঁদের ফিকহী ম জহাবের পাবন্দী সম্ভব নয়। কেননা, তন্মধ্যে কোন দৃঢ় লিপিবদ্ধ সংকলিত মজহাব নেই। ফিকাহ সংকলনের এই কাজ পরবর্তী ইমামগণই (ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল) করেছেন। যাঁরা সাহাবা-তাবেয়ীনদের ফতওয়া সমূহের মধু নিংড়ে সম্ভাব্য পরিস্থিতি ঘটার পূর্বে অগ্রিম ফতওয়া সমাধান করে বিধি-বিধান ও শাখা প্রশাখা উন্মোচন করতে পেরেছেন। যেমন ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানিফা। (শরহুল মুহাযযাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯১)

চার ইমাম ব্যতিত অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামগণের তাকলিদ কেন সম্ভব নয় তার খুব সুন্দর জবাব আল্লামা মুনাবী (রহঃ) তাঁর লিখিত গ্রন্থে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

"আমাদের জন্য এ আকিদা রাখা ওয়াজীব যে, চার ইমাম সহ সুফিয়ান সাওরী, ইবনে উইয়াইনা, ইমাম আওযায়ী, দাউদ যাহিরী, ইসহাক বিন রাহওয়াই প্রমুখ ইমামগণ হিদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সাহাবা, তাবেয়ীন ও ঐ সব মনীষীবর্গের

তকলিদ করা ইমামুল হারামাইনের মতে জায়েজ নয়, কেননা তাদের মজহাব সুবিন্যস্ত হয়নি। সুতরাং ফায়সলা ও ফতওয়া প্রদানে চার ইমাম ব্যতীত অন্যান্যদের তকলীদ করা নিষিদ্ধ।" (ফয়যুল কদীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা--২১০)

চার ইমাম ব্যতীত অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামগণের তকলীদ করা কেন সম্ভব নয় তার জবাব আল্লামা ইবনে তাইমিয়া(রহঃ) ও দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "কুরআন--হাদিসের আলোকে মুজতাহিদ ইমামগণের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। অতএব, মালিক, লাইস বিন সা'দ, আওযায়ী ও সাওরী এরা সকলে স্বীয় যুগের ইমাম। এঁদের একজনের তকলীদের যা হুকুম প্রত্যেকের তকলীদের তাই হুকুম। কোন মুসলমান বলতে পারবে না যে, এঁর তকলীদ জায়েয আর ওর তকলীদ জায়েজ নয়। কিন্তু যারা আমাদের যুগে এঁদের মধ্যে কারো তকলীদ করতে নিষেধ করেছেন, তারা দুটি কারণের মধ্যে একটি কারণে নিষেধ করেছেন,

(ক) তাদের মন্তব্য এই যে, এঁদের মজহাব সম্পর্কে ওয়াকীবহাল মানুষ জীবিত নেই।

(খ) তারা বলেন, ঐ সব মুজতাহিদগণের কথার খেলাফ বর্তমান যুগে 'ইজমা' হয়ে গেছে।" (আল ফাতাওয়াল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৪৬)

সুতরাং এখানে পরিষ্কার ভাবে প্রমাণ হয়ে গেল চার ইমাম ছাড়া অন্য যে সব মুজতাহিদ ইমামগণ পৃথিবীতে চার ইমামের আগে এসেছিলেন তাঁদের তকলীদ এইজন্য করা হয় না, যে তাঁদের ফতোয়া সংকলন করে ইলম সংরক্ষণ হয়নি এবং

তাঁদের মজহাব ও সুবিন্যস্ত হয়নি। আর সব থেকে বড় কথা হল, যদি সমস্ত মুজতাদিদদের তাকলীদ চালু থাকত তাহলে পৃথিবীতে মারাত্মক ফিৎনা শুরু হয়ে যেত। কেননা, মুসলমানরা বিভিন্ন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মুসলমান সমাজ টুকরো টুকরো হয়ে যেত। সেজন্য আল্লাহপাকের অসীম করুণায় চার মজহাবের সত্যতার উপর 'ইজমা' হয়ে যায় এবং বাকি মুজতাহিদদের মজহাবগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন, হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) সাত প্রকার আরবী ভাষায় কুরআন পাঠ করা আল্লাহ পাকের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে ছিলেন। এককভাবে যে কোন প্রকার আরবী ভাষায় পড়া জায়েয ছিল। হুজুর (সাঃ) অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই অবকাশটি মঞ্জুর করালেন। আল্লাহপাক অনুমতি দিলেন। কিন্তু হজরত উসমান (রাঃ) এর খিলাফতকালে যখন এই ভাষা ভিন্নতার কারণে মুসলমানদের পরস্পরের দ্বন্দ্ব হল এবং আরও বেশী ফেতনা ফাসাদের আশঙ্কা দেখা দিল তখন সাহাবাদের 'ইজমা' দ্বারা কুরআন মজীদকে শুধুমাত্র কুরাইশী ভাষাতে সন্নিবেশিত করে অবশিষ্ট ভাষাগুলি বাধ্যতামূলকভাবে রহিত করে দেওয়া হল। অন্যান্য ভাষার সমস্ত পাণ্ডুলিপিগুলি জবরদস্তী ছিনিয়ে নিয়ে ভস্মীভূত করা হল।

অনুরূপভাবে চার ইমামের সমসাময়িক যুগে চার মজহাব ছাড়াও মুসলমানেরা ছোট ছোট মজহাবে বিভক্ত ছিল। পরবর্তীকালে মুসলমান সমাজ ফিৎনা-ফাসাদের আশঙ্কায় কেবলমাত্র চার মজহাবের উপর মুসলমানদের মাঝে 'ইজমা' হয়ে গেল। কেননা, সমস্ত টুকরো টুকরো মজহাব থেকে চার মজহাবই নবী করীম (সাঃ) এর তরীকার বেশী নিকটবর্তী ছিল। আর রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "ইন্নাল্লাহা লা ইয়াজমা উম্মাতা মুহাম্মাদিন আলা যালালাহ" অর্থাৎ আমার উম্মত কোনদিনই গুমরাহীর উপর সমবেত (ইজমা) হবে না।

ইমামগণকে প্রভু বানানো শির্ক

প্রশ্ন নং ১২ ঃ আহলে হাদিস দলের লোকেরা চার ইমামের অনুসরণ করাকে শিরক প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে কোরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়াতটি পেশ করে বলেন, আল্লাহ বলেছেন, ‘‘তারা (ইয়াহুদ-খ্রিষ্টানেরা) আল্লাকে ছেড়ে তাদের আলিম ও দরবেশদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে।’’ (সুরা তওবা, আয়াত-৩১)

এই আয়াত দ্বারা আহলে হাদিস দলের লোকেরা বোঝাতে চায়, ইয়াহুদী এবং খ্রীষ্টানেরা তাদের আলেম ও দরবেশদেরকে প্রভূ বানিয়ে শিরক্ করেছে, তাহলে ম জহাবপন্থীরা চার ইমামের অন্ধ অনুসরণ করার দরুণ শিরকে হবে না কেন ?

উত্তর ঃ এর উত্তর মওলানা নাসিরুদ্দিন চাঁদপুরী সাহেব তাঁর ‘ইমাম মানব কেন’ পুস্তকে খুব সুন্দরভাবে দিয়েছেন। তিনি জাস্টিস আল্লামা তক্বী উসমানী (মুদ্দাযিল্লুহু) এঁর ‘তকলীদ কী শরয়ী হায়সিয়ত’ কিতাবের ১২৪-১২৫ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে এবং জাস্টিস তক্বী উসমানী (মুদ্দাযিল্লুহু) ১৯৫০ ছাপা ‘ইনসাইক্লোপোডিয়া’ ১৮ খণ্ডের ২২২-২২৩ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতিতে পোপ সম্পর্কে খ্রীষ্টানদের নিম্নলিখিত পাঁচটি আকীদা বর্ণনা করেছেন ঃ

১) খ্রীষ্টানেরা পোপকে এ Authoritor (স্বতন্ত্র দলীল) মনে করে।

২) তারা বিশ্বাস করে, পোপ আকাইদের বিষয়ে নির্দেশ জারি করার স্বাধীনতা রাখেন।

৩) তাদের ধারণা, পোপ হলেন Legislator (বিধান রচয়িতা)।

৪) পোপ সম্পর্কে তাদের এও আকীদা যে, তিনি Insallibilitor (ক্রুটিমুক্ত-নিষ্পাপ)।

৫) তারা বিশ্বাস করে। পোপ সর্বোপরি আইন প্রয়োগ পূর্ণ স্বাধীন। কেউ তার কোন কথা কিঞ্চিৎ লঙ্ঘন করতে পারে না।

এ হল খ্রীষ্টানদের (পোপ সম্পর্কে) আকিদা। পক্ষান্তরে, ইমাম অনুসারীগণ বলেনঃ

১) ইমাম নিজে দলীল নন। তিনি দলীলের মুখাপেক্ষী।

২) আকাইদ অধ্যায়ে তকলীদ (ইমাম অনুসরণ) করা নাজাইজ।

৩) ইমাম বিধান রচয়িতা নন। বরং তিনি সংবিধান ব্যাখ্যাকারী।

৪) ইমাম মুজাতাহিদের ভুল হতে পারে।

৫) প্রয়োজন বিশেষ নিজের ইমামকে ছেড়ে অন্য ইমামের রায় ধারণ করা যায়। এসব অকীদা ফিকাহ ও উসুলে ফিকহার বিভিন্ন কিতাবে লিপিবদ্ধ করা আছে।

এখানে দেখা যায়, খ্রীষ্টানদের আকিদার সাথে মজহাব মান্যকারীদের আকিদার সাথে কোন মিল নেই। উভয়ের আকিদার সাথে আকাশ পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। তাহলে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সম্পর্কিত উক্ত আয়াত মজহাব মান্যকারীদের ঘাড়ে চাপানো চরম মুর্খতার পরিচয় নয় তো আর কি ? তবে একথা অবশ্যই ঠিক যে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের আলেম উলামাদেরকে এবং দরবেশদেরকে প্রভূর আসনে বসিয়ে শিরক করেছে। তাই বলে ইমামদের অনুসরণ করলে শিরক হবে একথা যুক্তিসঙ্গত নয়। আর কোরআন শরীফের উক্ত আয়াত ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে মুসলমানদের সম্পর্কে নাযিল হয়নি।

ইমাম আবু হানিফাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় কেন ?

প্রশ্ন নং-১৩ ঃ আহলে হাদিস দলের লোকেরা অভিযোগ করে বলে, চার ইমামই যদি বরহক হন তাহলে অন্য ইমামগণের তুলনায় হানাফীরা কেবলাত্র ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কেই প্রাধান্য দেন কেন ?

উত্তর ঃ অন্যান্য ইমামগণের তুলনায় হুজুর (সাঃ) এর সব থেকে বেশী নিকটবর্তী ইমাম হলেন ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) খয়রুল কুরুন যুগের লোক ছিলেন এবং তিনি একজন বিশিষ্ট তাবেয়ীন ছিলেন। হুজুর (সাঃ) বলেছেন,

“সব থেকে উত্তম যুগ হল আমার যুগ তার পরে সাহাবাদের যুগ এবং তাবেয়ীনদের যুগ।”

আর ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) হলেন একজন বিশিষ্ট তাবেয়ীন তাই তিনি ছিলেন হুজুর (সাঃ) এর সব থেকে নিকটবর্তী। অর্থাৎ অন্যান্য ইমামগণের তুলনায় ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ছিলেন হুজুর (সাঃ) এর সব থেকে নিকটবর্তী যুগের মানুষ। ইমাম আবু হানিফা(রহঃ) ছাড়া অন্য ইমামগণ কেহ তাবেয়ীন ছিলেন না এবং হুজুর (সাঃ) এর নিকটবর্তী ছিলেন না।

লক্ষ করলে দেখা যায়, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর ইজতেহাদকে বাকি তিনজন ইমাম স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। যেমন, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)

কে ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বাকি তিনজন ইমামকে স্বীকৃতি দিয়ে যেতে পারেননি। কেননা, তিনি বাকি ইমামগণের পূর্বেই ইন্তেকাল করেছিলেন। যেমন ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম মালেক (রহঃ) ৯৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ১৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল(রহঃ) ১৪৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

এখানে দেখা যাচ্ছে সব ইমামের তুলনায় ইমাম আবু হানিফা(রহঃ) বেশী হুজুর (সাঃ) এর নিকটবর্তী ছিলেন। সেজন্য তাঁরা বাকি ইমামগণের তুলনায় বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং তাঁকেই ইমামে আযম বলা হয়। আরো লক্ষ করলে দেখা যায়। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বয়সের দিক থেকে ইমাম মালেক (রহঃ) এর থেকে ১৩ বছরের বড় ছিলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর থেকে ৭০ বছরের বড় ছিলেন ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল(রহঃ) এর থেকে ৬৬ বছরের বড় ছিলেন। অর্থাৎ একমাত্র ইমাম মালেক (রহঃ) ছাড়া বাকি ইমামগুলো ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কে চোখেও দেখে যায় নি। এমনকি যে বছর ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ইন্তেকাল করেন সেই বছর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) জন্মগ্রহণ করেন। আর যে বছর ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ইন্তেকাল করেন তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর বয়স মাত্র ৪ বছর ছিল।

এখানে সহজেই বোঝা যাচ্ছে সব ইমামের তুলনায় ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) হুজুর (সাঃ) এর বেশী নিকটবর্তী ছিলেন এবং সব ইমামগণ ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর ইমাম হওয়াকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেজন্যই বাকি ইমামগণের তুলনায় ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং ইমাম আযম বলা হয়।

'সিরাতুন নবী' গ্রন্থে লেখা আছে, ''হুজুর (সাঃ) ১১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। এখানে সহজেই বোঝা যাচ্ছে হুজুর (সাঃ) এর ইন্তেকালের ৬৯ বছর পর ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) জন্মগ্রহণ করেন, ৮২ বছর পর ইমাম মালেক (রহঃ) জন্মগ্রহণ করেন ১৩৯ বছর পর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৫ বছর পর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) জন্মগ্রহণ করেন। এখানে দেখা যাচ্ছে একমাত্র ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) হুজুর (সাঃ) এর সব থেকে বেশী নিকবর্তী ছিলেন।

আর সব থেকে বড় কথা হল, সব ইমামের থেকে মাসালা মাসায়েলের দিক থেকে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর মাসআলা হল সহজ ও সরল, যা প্রত্যেক মানুষ সহজেই আমল করতে পারে। আর হুজুর (সাঃ) কথা অনুযায়ী তাবেয়ীনদের যুগকেও 'খয়রুল কুরুন' বা 'উত্তম যুগ' বলা হয়। আর এই 'খয়রুল কুরুন' যুগের লোক ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)। সেজন্য ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং তাঁকে 'ইমাম আযম' বলা হয়।

পরিশেষে বলতে চাই, আহলে হাদিসদের কাজই হল হানাফীদের প্রতি অভিযোগ করা। তারা হানাফীদেরকে যতটা ঘৃণা করে ততটা তারা ইসলামকে মুহাববত করেনা। তাদের অভিযোগ হানাফীরা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) করে বেশী প্রাধান্য দেয়

কেন ? এটা তাদের একটা বিচিত্র অভিযোগ। কেননা, তারা যখন হানাফীদের এলাকায় আসে তখন তারা হানাফীদেরকে বলে ’তারা ইমাম আবু হানিফাকে অন্যান্য ইমামের তুলনায় বেশী প্রাধান্য দেয় কেন ? আর যখন শাফেয়ীদের এলাকায় আসে তখন তারা বলে ‘তারা শাফেয়ীকে অন্যান্য ইমামের তুলনায় বেশী প্রাধান্য দেয় কেন?’ এটা তাদের উদ্ভুত অভিযোগ। তাদের অভিযোগের কোন মাথামুণ্ডু নেই।

আমরা হানাফি না মুহাম্মদী ?

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ আহলে হাদিস দলের লোকেরা অভিযোগ করে বলে, হানাফীরা নিজেদেরকে ‘হানাফী’ বলেন কেন ? মুহাম্মাদী কেন বলেন না ? হানাফীদের থেকে তো খ্রীষ্টানরা অনেক ভালো কারণ তারা তাদের নবীর দিকে লক্ষ করে নিজেদেরকে ঈসাই বলে। তাহলে হানাফীরা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে লক্ষ করে ‘মুহাম্মাদী’ বলে না কেন?

উত্তর ঃ এই প্রশ্নটি হল নিছক পাগলামী মূলক প্রশ্ন। কেননা, আমরা প্রত্যেক মুসলমানই জন্মসূত্রে মুহাম্মাদী এবং হানাফী দুইই। আমরা ইসলাম ধর্মলম্বী বলে ‘মুসলমান’। মুহাম্মদ (সাঃ) এর শরীয়াত অনুসরণ করি বলে ‘মুহাম্মাদী’। আর ইমামে আযম আবু হানিফা (রহঃ) এর ফিকাহকে অনুসরণ করি বলে ‘হানাফী’। এখন যদি কেউ এসে বলে আমরা ‘হানাফী’ না ‘মুহাম্মদী’ তাহলে তাকে পাগল ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেউ যদি বলে, 'মুসলমানরা বুখারীর হাদিস মানে না নবী মুহাম্মদের হাদিস মানে ? আমরা ভারতবাসী না বাঙালী ? আজকে শুক্রবার না কার্ত্তিক মাস ? তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যক্তিকে পাগলা গারদের ভরা হবে ? কেননা, প্রত্যেক মুসলমান মাত্রেই জানেন বুখারী **শ**রীফে যে হাদিস আছে তা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এরই হাদিস, আর সবাই জানেন প্রত্যেক বাঙালী মাত্রেই ভারতবাসী। আর শুক্রবার কার্তিক মাসেরই অন্তর্ভুক্ত।

অনুরূপভাবে আমরা প্রত্যেক হানাফী মাত্রেই 'মুহাম্মদী'। হানাফী হলে ব্যক্তি 'মুহাম্মাদী' থেকে বাদ হয়ে যাবে এমন কোন কথা নেই।

আর আহলে হাদিসরা যে উদাহরণ দেয়, 'খ্রীষ্টানরা অনেক ভালো কারণ তারা তাদের নবীর দিকে লক্ষ্য করে নিজেদেরকে ঈসাই বলে।' এটা তাদের নিছক ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা, খ্রীষ্টানদের মধ্যে দুটি ভাগ আছে একটি হল, ক্যাথলিক অপরটি প্রটেস্ট্যাণ্ট। তারা উভয় দলই নিজেদেরকে ঈসাই বলে দাবী করে।

অনুরূপভাবে, হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী এই চার মজহাবের অনুসারীরা অর্থাৎ আমরাও নিজেদেরকে 'মুহাম্মদী' বলে দাবী করি।

পাল্টা প্রশ্ন ঃ আমাদের একটি নাম হানাফী আর আপনারা তো বহু নামে বহুরূপী। যেমন, মুহাম্মাদী, আহ্লে হাদিস, সালাফী, আহ্লে তওহিদ, মুওয়াহীদ, গায়ের মুকাল্লিদ, লা মাজহাবী। বলুন, কোন্ নাম ধরে ডাকলে আপনারা খুশি হবেন ?

চার ইমাম কার মুকাল্লিদ ছিলেন ?

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ আহলে হাদিস দলের লোকেরা প্রশ্ন করে। ইমামের তকলীদ করা যদি ওয়াজীব হয় তাহলে চার ইমাম কার মুকাল্লিদ ছিলেন ?

উত্তর ঃ এই রকম প্রশ্ন করে আহলে হাদিস দলের লোকেরা হানাফীদের পর্যুদস্ত করার চেষ্টা করেন। তাঁরা প্রশ্ন করেন তকলীদ যদি ওয়াজীব হয় তাহলে চার ইমাম কার মুকাল্লিদ ছিলেন ? তাঁরা যদি কোন ইমামের মুকাল্লিদ না হন তাহলে নিশ্চয় তারা গায়ের মুকাল্লিদ ছিলেন। তাঁরা যদি কোন ইমামের অর্থাৎ কোন মুজতাহিদের তাকলীদ না করেও বহরহক হন তাহলে আহলে হাদিসরা কোন ইমামের তাকলীদ না করেও বরহাক হবে না কেন ?

এখানে উত্তরে বলব, গায়ের মুকাল্লিদদের এরকম ধরণের প্রশ্ন তাকলীদের প্রকৃত সংজ্ঞা না জানার ফল। তাঁরা যদি তকলীদের প্রকৃত সংজ্ঞা জানতেন তাহলে তাঁরা এরকম ধরণের প্রশ্ন করতেন না। তকলীদ ঐ ব্যক্তির জন্য ওয়াজীব যে ব্যক্তি ইজতেহাদের মর্তবায় পোঁছায়নি। আর যে ব্যক্তি ইজতেহাদের মর্তবায় পোঁছে গেছেন অর্থাৎ যিনি মুজতাহিদ তাঁর জন্য তাকলীদ করা ওয়াজীব নয়। কেননা, তিনি পরিপূর্ণভাবে কোরআন ও হাদিস বুঝতে পারেন এবং কোরআন হাদিস থেকে মাস আলা মাসায়েল ইজতেহাদ করে ইস্তেম্বাত করতে পারেন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্রত্যেক মুসলমান জামাআতে নামায পড়ার সময় ইমাম সাহেবের এক্তেদা করেন। এখানে আমাদের প্রশ্ন, ইমাম সাহেব কার এক্তেদা করেন ? আর আমরা প্রত্যেক মুসলমান নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতি। এখানে আমাদের প্রশ্ন, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কার উম্মতি ছিলেন ? প্রত্যেক মুসলমানের জন্য নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কলমা পড়া ওয়াজীব। এখানে আমাদের প্রশ্ন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কার কলমা পড়তেন ?

এর উত্তরে হয়তো গায়ের মুকাল্লিদরা বলবেন, জামাআতের সময় ইমাম সাহেব কারো এক্তেদা করেন না কেননা, তিনি নিজেই ইমাম, আর নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কারো উন্নতি ছিলেন না কেননা, তিনি স্বয়ং নবী, আর নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কারো কলমা পড়তেন না কেননা তিনি স্বয়ং নবী।

অনুরূপভাবে আমরাও এখানে বলব, যেমন-ইমাম সাহেব স্বয়ং ইমাম হওয়ার জন্য কোন ইমামের মুক্তাদী নন, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং নবী হওয়ার জন্য কারো উম্মতি নন, আর নবী মুহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং নবী হওয়ার জন্য কারো কলমা পড়তেন না, ঠিক তেমনি চার ইমাম স্বয়ং মুজতাহিদ হওয়ার জন্য কারো মুকাল্লিদ নন। চার ইমাম কোনো ইমামের মুকাল্লিদও ছিলেন না এবং গায়ের মুকাল্লিদও ছিলেন না তাঁরা প্রত্যেকে মুজতাহিদ ছিলেন। আর গায়ের মুকাল্লিদ ওই ব্যক্তিকে বলা হয় যে নিজে ইজতেহাদ করতে পারে না অর্থাৎ নিজে মুজতাহিদ নয় এবং কোনো মুজতাহিদের তাকলীদও করে না। গায়ের মুকাল্লিদদের কাজই হল ফিকাহ বিদদের গালি দেওয়া এবং মুকাল্লিদদের মুশরিক বলা।

প্রশ্নোত্তর পর্ব আপাততঃ এখানেই শেষ হল। এছাড়াও গায়ের মুকাল্লিদরা বহু প্রশ্ন করে যা অবান্তর ও হাস্যস্পদ। যেমন জনাব আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব তাঁর ‘কাট হুজ্জতির জওয়াব’ পুস্তকের একেবারে শেষে ‘জবাব চাই’ অধ্যায়ে হানাফীদের প্রতি কতকগুলি প্রশ্ন ছুঁড়েছেন। যার যথাযথ জবাব এই কিতাবে দেওয়া হয়েছে। আরও কতকগুলি প্রশ্ন করেছেন যা অবাস্তব ও হাস্যস্পদ। যেমন, তিনি প্রশ্ন করেছেন, ‘ঐ চারজন ইমাম ওয়াহীর মারফত শিক্ষা লাভ করেছিলেন না আলেমদের কাছ থেকে শিখেছিলেন ? যদি ওয়াহীর মারফত শিখে থাকেন তো নবীর (দঃ) মধ্যে ও তাঁদের মধ্যে তফাৎ কোথায় ? আর যদি উস্তাদের কাছে শিখে থাকেন তো উস্তাদ বড় না তাঁরা বড় ? উস্তাদ যদি বড় হন তাহলে উস্তাদের তকলীদ কেন করা হয় না ?” এই প্রশ্নটি জনাব বর্ধমানী সাহেবের নিছক পাগলামীমূলক প্রশ্ন। কেননা, পৃথিবীর কোন মজহাবের মানুষ এরকম বলে না যে চার ইমাম ওহীর মাধ্যমে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি আরও প্রশ্ন করেছেন, ‘হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত উমর ফারুক (দঃ) (এখানে (দঃ) হবে না (রাঃ) হবে, এখানেও কি জনাব বর্ধমানী সাহেবের প্রেসে ভুল করে (রাঃ) বাদ দিয়ে (দঃ) করে দিয়েছে ?) হজরত উসমান যিননুরায়েন (রাঃ) ও হযরত আলী মুরতাযা (রাঃ) এই চারজন খলিফা চারজন ইমামের চেয়ে উত্তম না চারজন ইমাম চারজন খলিফার চেয়ে উত্তম ?”

তিনি আরও প্রশ্ন করেছেন, “হযরত ইমাম হাসান (রাঃ), হযরত ইমাম হুসায়েন (রাঃ), হযরত ইমাম জইনুল আবেদীন (রাঃ), হযরত ইমাম বাকের (রাঃ) ও হজরত ইমাম জাফর-ইনারা চার ইমামের চেয়ে উত্তম না চারজন উক্ত ইমামগণের চেয়ে উত্তম?”

এরকম ধরণের প্রশ্ন শুনেই বোঝা যায় জনাব বর্ধমানী সাহেবের বিদ্যার দৌড় কতটা। আমরা আহলে সুন্নতুল জামাআতের কোন মুসলমান চার ইমামকে খুলাফায়ে রাশেদীন অর্থাৎ-হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), হজরত উমর ফারুক (রাঃ) হজরত উসমান জিন্নুরায়েন (রাঃ) ও হজরত আলী (রাঃ) এর থেকে উত্তম বলা তো দূরের কথা। এই চার খলিফার জুতোর ধূলার সমতুল্য ও মনে করি না। এবং আমরা নিজেদেরকে এই চার ইমামের জুতোর ধুলার সমতুল্যও মনে করি না। এখানে জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব নিছক বোকা মানুষের মতো প্রশ্ন করেছেন।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) হাদিস শরীফে বলেছেন, “পরিমিত ব্যয় অর্ধেক পাথেয়, মানুষকে ভালবাসা অর্ধেক বুদ্ধির পরিচয়-এবং উত্তম প্রশ্ন অর্ধেক জ্ঞান।”

আর জনাব বর্দ্ধমানী সাহেব এখানে অবান্তর প্রশ্ন করে সম্পূর্ণ বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়েছেন।

এই প্রশ্নের জবাব দিন

আমাদের আহনাফের তরফ থেকে আহলে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদদের কাছে এর আগে বহু প্রশ্ন আমাদের আলেম উলামারা করেছেন। আজ পর্যন্ত সেইসব প্রশ্নগুলির গায়ের মুকাল্লিদদের গলায় তলোয়ারের মতো লটকে আছে। কোন প্রশ্নের উত্তর কোন গায়ের মুকাল্লিদ বা আহলে হাদিসদের হালালী সন্তান আজ পর্যন্ত দিতে পারে নি। আর ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত দিতে পারবেও না।

আহলে হাদিসদের দাবী কোরআন ও সহীহ হাদিস ছাড়া কোন কিছুকে দলীল বলে মানা যাবে না। এমনকি কোন উম্মতের কুরআন-হাদিশ সম্মত রায় বা কিয়াসকেও দলীল বলে মানা যাবে না। আহলে হাদিসরা যে বলেন কোরআন ও সহীহ হাদিস ছাড়া কোন কিছুকে দলীল বলে মানা যাবে না, তাঁদের কাছে আমার এই নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা রইল। এসব প্রশ্নের জবাব আমাদেরকে কোরআন ও সহীহ হাদিস থেকে দিতে হবে। কোন ফহীমুদ্দীন সহীমুদ্দীনের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদিও এই প্রশ্নগুলি আমাদের আকাবিরিনরা আগেও করেছেন, আমিও আবার করলাম। যথা-

১ নং প্রশ্ন ঃ কোরআন শরীফের সুরা নেসায় ৩নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন, ‘তোমাদের পছন্দ মত তোমরা (একসঙ্গে) বিবাহ করতে পার দুইজন, তিনজন ও চারজনের বেশী রমনীকে বিবাহ করা শরীয়াতে হারাম। আর হাদিস শরীফে আছে হুজুর (সাঃ) একসঙ্গে নয়জন পর্যন্ত স্ত্রী ছিল। তাহলে কি তিনি কোরআন শরীফের হুকুম অমান্য করেই এতগুলো বিবাহ করেছিলেন? আর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের অনুকরণীয়। তাহলে আহলে হাদিসরাও কি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে অনুকরণ করতঃ একসঙ্গে নয়জন রমনীকে বিবাহ করা হালাল মনে করেন ?

এর জনাব কোরআন ও সহীহ মরফু হাদিস দ্বারাই দিতে হবে। তাছাড়া অন্য কোন প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না।

২ নং প্রশ্ন ঃ কোরআন শরীফের সুরা বাকারার শুরুতে বলা হয়েছে ‘হুদাল্লিল মুত্তাকিন- - - - ” অর্থাৎ আল্লাহপাক মোমিন মোত্তাকি পরহেজগার দিগকেই শুধু

হেদায়াত করবেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে কখনো হেদায়াত করবেন না। কিন্তু অসংখ্য সহীহ হাদিস ও গ্রহণযোগ্য ইতিহাসের বর্ণনায় প্রমাণিত যে অসংখ্য কাফের, ফাসেক কোরআন পাক দ্বারাই হেদায়াত প্রাপ্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাহলে কোরআন পাকের আয়াত মিথ্যা ? না সহীহ হাদিসগুলি মিথ্যা ? এর জবাব কোরআন ও সহীহ হাদিস দ্বারাই চাই। কোরআন ও হাদিস ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ গ্রহণ যোগ্য হবে না।

৩ নং প্রশ্ন ঃ কোরআন শরীফের সুরা নূর আয়াত নং ২ এ বলা হয়েছে যে, ব্যাভিচারী ও ব্যভিচারিনী উভয়কে একশত করে কোঁড়া মারতে হবে। কিন্তু হাদিশ শরীফে আছে যে, রজম অর্থাৎ ব্যভিচারের শাস্তি কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলে পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। এখানে কোরআনের কথা মানব ? না হাদিসের কথা মানব ? কোনটা মানব ? এর জবাব কোরআন বা সহীহ হাদিস দ্বারা চাই।

৪ নং প্রশ্ন ঃ আমরা যে পদ্ধতিতে নামায পড়ে থাকি বা আহলে হাদিসরা যে পদ্ধতিতে নামায পড়ে থাকেন তার নিয়মাবলী যেমন দুই বা চার রাকাত নামাযে আরকান, আহাকাম, ফরজ, সুন্নত মুস্তাহাবগুলি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পালন করে থাকি। যেমন কিয়াম, রুকু, সিজদা, কওমা, জালসা, কেরাত, রুকু সিজদার তসবীহ, তাসাহুদ, দরুদ শরীফ, দোয়া মাসুরা ইত্যাদির পর ধারাবাহিক নিয়মাবলী কোরআন ও সহীহ হাদিসে যদি থাকে তাহলে প্রমাণ চাই। ফিকাহ শাস্ত্রের আশ্রয় নিলে আমরা শুনব না।

৫ নং প্রশ্ন ঃ মনে করুন কোন লোক নামায পড়ার সময় সুরা ফাতেহা পড়ার জায়গায় ভুল করে দরুদ শরীফ পড়ে ফেলল এবং দরুদ শরীফ পড়ার জায়গায় সুরা ফাতেহা পড়ে ফেলল এবং দয়া মাসুরা পড়ার জায়গায় কোরআনের কোন অংশ ভুল করে পড়ে ফেলল। তাহলে তার কি করণীয় হবে কোরআন বা সহীহ মরফু হাদিস দ্বারা প্রমাণ চাই। কোরআন ও হাদিস ছাড়া অন্য কোন দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না।

৬ নং প্রশ্ন ঃ সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থে (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ) যদি নামায পড়ার নিয়মাবলী পরস্পর ধারাবাহিক ভাবে থাকে তাহলে হাদিশ দ্বারা প্রমাণ করুন। যদি না থাকে তাহলে ঐ ছয়জন মুহাদ্দিস কিভাবে নামাজ পড়তেন ? তার দলীল পেশ করুন।

৭ নং প্রশ্ন ঃ মহিসের গোস্ত কিংবা মহিসের দুধ বা মহিষের দুধ থেকে তৈরী ঘি, মাখন, দই বা লস্যি খাওয়া হারাম না হালাল ? কোরআন বা সহীহ হাদিস থেকে প্রমাণ পেশ করুন। কোরআন ও হাদিস ছাড়া অন্য কোন দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না।

৮ নং প্রশ্ন ঃ তুলার কাঁথা বা তোষক পেসাবে ভিজে গেছে। তা পাক করার নিয়ম কি? কোরআন ও সহীহ হাদিস ছাড়া অন্য কোন দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না।

৯ নং প্রশ্ন ঃ হাদিস শরীফে আছে "তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোজা ছাড়ো অর্থাৎ ঈদ পালন কর।" সম্প্রতি মানুষ চাঁদে পদার্পন করেছে। এখানে আমাদের প্রশ্ন, চাঁদের মাটিতে বিচরণকারী মানুষ কি দেখে রোযা রাখবে এবং কি

দেখে ঈদ পালন করবে ? এর উত্তর কোরআন বা সহীহ হাদিস দ্বারা চাই অন্য কোনো প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না।

১০ নং প্রশ্ন ঃ কোন লোক যদি মোবাইলের রিংটোনে আযান লাগিয়ে ম সজিদে মাইক্রোফোন লাগিয়ে দিনে পাঁচবার আযান দেয় তাহলে সেটা জায়েয হবে কি হবে না। কুরআনের আয়াত বা সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণ করুন। অন্য কোন প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না।

১১ নং প্রশ্ন ঃ পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত আহলে হাদিস মৌলবী লেখক আইনুল বারী আলিয়াবী সাহেব 'স্বপ্নের দেশে বাইশ দিন' নামক কিতাবে ১১১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, হজ্বের জন্য হায়েয (মাসিক) বন্ধ করা বৈধ।' এটা কোরআনের আয়াত বা সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণ করুন।

১২ নং প্রশ্ন ঃ যদি নামাযে ইমাম ফজর, মাগরিব এবং এশাতে আস্তে কেরাত করে ফেলে (ভুল করে) তাহলে তার নামায ভঙ্গ হবে, না মাকরূহ হবে, তা সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণ করুন ?

১৩ নং প্রশ্ন ঃ চার রাকাত ফরজ নামাযে যদি কেউ ভুল করে প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতেহার পর কোন সুরা পড়ল না এবং তৃতীয় ও চতুর্থ যাকাতে ভুল করে সুরা ফাতেহার পর অন্য সুরা পড়ে ফেলল তাহলে তার নামায ভঙ্গ হবে, না মাকরূহ হবে? তার কি করণীয় তা কোরআন বা সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণ করুন। কোরআন ও হাদিস ছাড়া অন্য কোন দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৪ নং প্রশ্ন ঃ কুকুরের পেটে ছাগলের বাচ্চা হয়েছে। উক্ত ছাগলকে কুরবানী করা চলবে কি চলবে না ? কিয়াস না করে সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণ করুন।

১৫ নং প্রশ্ন ঃ কুরবাণী করণেওয়ালা ব্যক্তির মধ্যে কি কি শর্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক? কোরআন বা শুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণ করুন।

১৬ নং প্রশ্ন ঃ নামাযের সময় কিবলামুখী হওয়া ফরজ। কিন্তু যে ব্যক্তি বিমানে বা যে কোন মহাকাশযানে আছে, সে কোন দিকে মুখ করে নামায পড়বে ? এর প্রমাণ কোরআন বা সহীহ হাদিস থেকে দিন। কোরআন হাদিস ছাড়া অন্য কোন দলীল এখানে গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৭ নং প্রশ্ন ঃ মনে করুন ভারতবর্ষের কোন মানুষ রমযান মাসে ভোর ৪টের সময় সেহেরী খেয়ে এরোপ্লেনে চড়ে মেক্সিকো সিটি রওনা হল। তিন ঘন্টার মধ্যে মেক্সিকো সিটি পৌঁছে গিয়ে দেখল সেখানে সন্ধে ৬.৩০ বাজছে এবং সেখানকার মুসলমানরা এফতার করছে। তাহলে ভারতীয় মুসলমানটি সেখানে মাত্র তিন ঘণ্টার রোযা রেখে এফতারে শামিল হতে পারবে কি পারবে না ? কোরআন ও সহীহ হাদিস দ্বারা উত্তর দিন। কোরআন ও হাদিস ছাড়া অন্য কোন দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৮ প্রশ্ন ঃ কোন ভারতীয় মুসলমান যদি ফজরের নামাজ পড়ে মেক্সিকো সিটি রওয়া হয় এবং উক্ত মুসলমান ব্যক্তি তিন ঘণ্টার মধ্যে যদি মেক্সিকো সিটি পৌঁছে গিয়ে দেখে সেখানকার মুসলমানেরা এশার নামায পড়ছে। তাহলে

ভারতীয় মুসলমানটি সেখানে এশায় জামাআতে শরীফ হয়ে এশার নামায পড়তে পারবে কি পারবে না ? যদি এশার নামায পড়ে তাহলে আরো জোহর, আশর ও মাগরিবের নামায কাজা পড়তে হবে না হবে না ? মাথা ঠাণ্ডা করে কোরআন ও সহীহ হাদিস দ্বারা উত্তর দিন। কোরআন ও হাদিস ছাড়া অন্য কোন দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৯ নং প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি যদি ফজরের নামায পড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে বেরুলো। এবং সে যে দেশেই পৌঁছলসেখানেই সে সেখানকার মানুষকে ফজরের নামায পড়তে দেখলো। তাহলে একমাসের পৃথিবী ভ্রমণে যেখানেই গেল সেখানেই ফজরের সময় পেল। তাহলে সে বাকি জোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায পড়বে কি করে ? না কি সে একমাস ধরে ফজরেরই নামায পড়ে যাবে ? ঐ ব্যক্তির কি করণীয় কোরআন ও সহীহ হাদিস দ্বারা জবাব দিন। কোরআন ও হাদিস ছাড়া অন্য কোন দলীল গ্রহণয়োগ্য হবে না।

২০ নং প্রশ্ন ঃ মহাকাশে সবসময় সূর্যের আলো দেখা যায়। তাহলে যে ব্যক্তি ম হাকাশে বিচরণ করে সে ফজর, আসর, মাগরীব ও এশার নামায কিভাবে পড়বে ? কোরআন ও সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমান করুন।

২১ নং প্রশ্ন ঃ অনুরূপভাবে মহাকাশে বিচরণকারী ব্যক্তি রোযা কি নিয়মে রাখবে ? কোরআন ও সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণ করুন।

২২ নং প্রশ্ন ঃ মরু প্রদেশে যেখানে ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি সেখানে মানুষ কি নিয়মে নামায পড়বে ও কি নিয়মে রোযা রাখবে ? সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণ করুন।

আহ্লে হাদিসরা বলেন আল্লাহ্ আরশে সমাসীন সেইজন্য তাঁদেরকে এই তিনটি প্রশ্ন করা হল..........

২৩ নং প্রশ্ন ঃ যদি আল্লাহ্ আরশে সমাসীন থাকেন তাহলে যখন আরশ ছিল না তখন আল্লাহ্ কোথায় ছিলেন ?

২৪ নং প্রশ্ন ঃ যদি আল্লাহ্ আরশে সমাসীন থাকেন তাহলে আল্লাহ্ আরশের বাসিন্দা হয়ে গেলেন এবং আরশ আল্লাহর বাসস্থান হয়ে গেল। আর উসুলী কথা এই যে, বাসিন্দার থেকে বাসস্থান আয়তনে বড় হয়। যদি বাসস্থান অর্থাৎ আরশকে আল্লাহর থেকে আয়তন্ বড় মনে করা হয় তাহলে নাউযুবিল্লাহ্ আল্লাহ্কে আরশের থেকে ছোট মনে করা হল। তাহলে আহ্লে হাদিসরা 'আল্লাহু আরশ' না বলে 'আল্লাহু আকবার' বলে কেন ?

২৫ নং প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ অসীম অর্থাৎ সীমাহীন আর আরশ সীমাহীন নয় অর্থাৎ সসীম। তাহলে সীমাহীন আল্লাহ্ সসীম আরশের মধ্যে সমাসীন কিভাবে হতে পারেন? এখানে আহ্লে হাদিসরা আল্লাহ্কে সীমাহীন না বলে আল্লাহ্র শানে গুস্তাখী ও বেয়াদবী করলে নাকি ?

এই ২৫টি প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকে দিতেই হবে। তা না হলে আমরা কোন কথায় শুনব না। যদি হিম্মত হয় তাহলে বই লিখে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

সম্পূর্ণ

মূল্যবান উক্তি

১) বিখ্যাত আহলে হাদিস মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেব লিখেছেন, 'দীর্ঘ ২৫ বছরের অভিজ্ঞতায় আমি জানতে পারলাম যে, যারা নিজ অজ্ঞতা বশতঃ সাধারণ মোজতাহেদ এবং তাকলীদ মোতলাককে ছেড়ে দেয়, তাদের শেষ পরিণতি হয় ইসলামকেই বর্জন করা। অতঃপর তারা ইসলাম বর্জন করে কেহবা খৃষ্টান কেহবা লা-মাজহাব অর্থাৎ কোন ধর্ম বা নীতির গণ্ডিতে থাকে না বরং আহকামে শরীয়াত থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত স্বাধীন করে ফাসেক অথবা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। (এসাআতুসুন্নাহ)

২) ভারত বিখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন "হুজুর (সাঃ) আমাকে (কাশফের মাধ্যমে) বুঝিয়ে দিয়েছেন যে প্রচলিত হানাফী ম জহাব একটি উত্তম পন্থা যা অন্যান্য মজহাব বা তরিকা থেকে উত্তম। যা ইমাম বুখারী (রহঃ) এর জমানায় সংগৃহীত ও লিখিত হাদিসগুলির সঙ্গে অতিশয় সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।" (ফুয়ুজুল হারামাইন, পৃষ্ঠা-৪৮)

৩) শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) আরো লিখেছেন, "ভারতবর্ষের সাধারণ (যারা মোজতাহিদে মোতলাক নয়) লোকদের প্রতি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর মজহাব অবলম্বন করা ওয়াজীব এবং ঐ মজহাব ত্যাগ করা হারাম।" (আল ইনসাফ কি বায়ানিল ইখতিলাফ, পৃষ্ঠা--৭০)

৪) আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী (রহঃ) লিখেছেন, ‘‘আমাদের ইমামগণ বলেছেন, বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে, আবু হানিফা, শাফিয়ী, মালিক ও আহমদ বিন হাম্বল এই চার ইমাম ছাড়া অন্য কারো তকলীদ জায়েয় নয়।’’ (ফতহুল মুবীন, পৃষ্ঠা-১৯৬)

৫) কোরআন শরীফে মহান আল্লাহপাক বলেছেন, ‘হে মুমিনেরা ! তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসুলের অনুগত হও, আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা ‘উলিল আমর’ (মুজতাহিদ, ফকিহ) ব্যক্তিদের অনুগত হও। (সুরা নিসা, আয়াত-৫৯)

দশ লক্ষ্য টাকার একটি চ্যালেঞ্জ

যদি কোন গায়ের মুকাল্লিদ, লা মাজহাবী (বেদাতী) ফিরকার লোক বা আলেম আমার কাছে কোরআন শরীফের আয়াত বা সহীহ হাদিস দ্বারা একথা প্রমাণ করে দিতে পারে যে, চার ইমামের মধ্যে যে কোন একজন ইমামের তকলিদ করলে মুশরিক হয়ে যাবে অথবা যদি আহলে সুন্নতুল জামাআতের বিদগ্ধ মুহাদ্দিস কেরামদের ফতোয়া দেখিয়ে দিতে পারেন যে চার ইমামের মধ্যে একজন ইমামের তকলীদ করলে মুশরিক হয়ে যাবে তাহলে আমার তরফ থেকে ১০ লক্ষ টকা নগদ পুরস্কার দেওয়ার ওয়াদা রইল।

যদি আমি টাকা দিতে না পারি তাহলে উপরিউক্ত কথাগুলি আমার সামনে যিনি প্রমাণ করে দিতে পারবেন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নেব এবং সঙ্গে সঙ্গে ‘আহলে হাদিস’ মজহাব গ্রহণ করে নেব।

ইতি---

মুহাম্মদ আব্দুল আলিম

গ্রাম-শালজোড়, পোঃ--লোকপুর,

থানা-খয়রাশোল, জেলা-বীরভূম, পিন--৭৩১১২৪

Email-md.abdulalim1988@gmail.com

Mob- +91-9635458331/+91-8926199410

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১) তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে (অনলাইন/অফলাইন) ৩০/-

২) ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে? (অনলাইন/অফলাইন) ১৫/-

৩) এরা আহলে হাদীস না শিয়া? (অনলাইন/অফলাইন) ২০/-

৪) ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলীদ
(আহলে হাদীস ফিৎনার নতুন রুপ) (অফলাইন/অফলাইন) ৬০/-

৫) আল কালামুস সরীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ
(৮ রাকাআত তারাবীহর খন্ডন ও ২০ রাকাআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমান) (অনলাইন/অফলাইন) ৭০/-

৬) ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খন্ডন (অনলাইন) ৫০/-

৭) আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয় (অনলাইন) ৪০/-

৮) তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান (অনলাইন) ৩৫/-

৯) সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন? (প্রকাশিতব্য) ----

১০) ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ (প্রকাশিতব্য) ----

১১) আমরা সবাই মৌলবাদী (প্রকাশিতব্য) ----

১২) কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা (অনলাইন) ৩০/-

১৩) আমরা সবাই তালিবান (প্রকাশিতব্য) ----

১৪) রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ? (প্রকাশিতব্য) ----

১৫) মুহাররাম মাসে তাজিয়াবাজী (অনলাইন) ২০/-

১৬) মাসআলা আমীন বিল জেহের (অনলাইন) ২০/-

১৭) সুন্নতে রাসুলে আকরাম ফি কিরাআত খলফল ইমাম
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সুরা ফাতেহা পাঠ) (প্রকাশিতব্য) ----

১৮) সুন্নতে রাসুলুস সাকইল ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন (অনলাইন) ৫০/-

১৯) তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত (প্রকাশিতব্য) ----

২০) গুমরাহীর নায়ক ডাঃ জাকির নায়েক (প্রকাশিতব্য) ----

২১) আকিদা হায়াতুন নবী (সাঃ) (অনলাইন) ৩০/-

২২) বেদ কি আল্লাহর বানী ? (অনলাইন) ৩০/-

২৩) আসুন আমরা সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলিকে খতম করি (অনলাইন) ২০০/-

২৪) আমিরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ (অনলাইন) ৪০/-

২৫) শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য) ----

২৬) তাযকিরাতুল মুজাহিদীন (প্রকাশিতব্য) ----

২৭) নাস্তিক্যবাদ নিপাত যাক (অনলাইন) ৫০/-

২৮) তথাকথিত নাস্তিক প্রবীর ঘোষের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য) ----

২৯) নাস্তিকতাবাদীদের কফিনে শেষ পেরেক (প্রকাশিতব্য) ----

৩০) যুক্তিবাদীদের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য) ----

৩১) নাস্তিকের অপবাদ খন্ডন (প্রকাশিতব্য) ----

৩২) প্রবীর ঘোষকে অপেন চ্যালেঞ্জ (অনলাইন) ১০/-

৩৩) তসলিমা নাসরিনকে অপেন চ্যালেঞ্জ (অনলাইন) ১০/-

৩৪) নাস্তিক অভিজিৎ রায়ের অপবাদ খন্ডন (অনলাইন) ৫০/-

৩৫) হিন্দুধর্মে গো-মাংস খাওয়ার প্রমান (অনলাইন) ১০/

৩৬) তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা নামায (অনলাইন) ২৫/-

৩৭) ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ফাঁস আইএস ইসরাইলের সৃষ্টি (অনলাইন) ৬০/-

৩৮) মুজাহিদ নারী ডাঃ আফিয়া সিদ্দিকী (অনলাইন) ৩০/-

৩৯) গণতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ (অনলাইন) ৮০/-

৪০) রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে লা মাযহাবী আনওয়ারুল হক ফাইযীর মিথ্যাচারের জবাব (অনলাইন) ২০-

৪১) ভারতে আইবি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো) সন্ত্রাস ও মুসলমান (অনলাইন) ২০/-

৪২) ‘আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব’ এর পোষ্ট মর্টেম (অনলাইন) ৪০/-

৪৩) নাসীরুদ্দীন আলবানীকে নিয়ে আহলে হাদীসদের বাড়াবাড়ি (অনলাইন) ৪০/-

৪৪) হাদীস গবেষনায় লা মাযহাবী জুবাইর আলী যাই এর জালিয়াতি (অনলাইন) ৩৫/-

৪৫) লা মাযহাবী আনওয়ারুল হক ফাইযীর পোষ্ট মর্টেম (অনলাইন) ৩০/-

৪৬) ইতিহাস বিকৃতির প্রয়াস ও বেরেলী ফিৎনার আবির্ভাব (প্রথম প্রকাশ - ২০১০ ফেব্রুয়ারী, বর্তমানে বাজেয়াপ্ত) ৩০/-

৪৭) নামাযে হাত বাঁধা নিয়ে আনওয়ারুল হক ফাইযীর মিথ্যাচারের জবাব (অনলাইন) ৩০/-

৪৮) রফয়ে ইয়াদাইন প্রসঙ্গে ইবনে ওমর (রাঃ) হাদীসের বিরুদ্ধ
আনওয়ারুল হক ফাইযীর অপবাদ খণ্ডন (অনলাইন) ৩০

৪৯) নামাযে নারী পুরুষের নামাযে পার্থক্য (অনলাইন) ৩৫/-

৫০) মৌদুদী মতবাদের স্বরূপ উন্মোচন (অনলাইন) ৩০/-

৫১) আল কুরআনের আমোঘ ঘোষণা নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন করা যাবেনা (অনলাইন) ২০/-

৫২) আহলে হাদীসদের নিকটে ১০০টি প্রশ্ন (অনলাইন) ২০/-

৫৩) মানবতার শত্রু আমেরিকা (অনলাইন) ১০/-

৫৪) মুহাদ্দিস সম্রাট ইমাম বুখারী (রহঃ) [অনলাইন] ৮০/-

অনুদিত পুস্তক

১) হাদীস এবং সুন্নতের মধ্যে পার্থক্য (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখকঃ হুজ্জাতুল্লাহফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহঃ)] ----

২) আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সাথে মতবিরোধ। (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখকঃ আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহঃ)] ----

৩) হযরত মুহাম্মাদ এবং ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ। (মূল হিন্দী লেখকঃ ডঃ এইচ এ শ্রীবাস্তব/ অনলাইন) ৩০/-

৪) কল্কি অবতার এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) [মূল হিন্দী লেখকঃ ডাঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়] ৩০/-

পুস্তক সংগ্রহের ঠিকানা

১) লেখকের বাড়ীর ঠিকানায়।

২) ওসমানিয়া বুক ডিপো, কোর্ট মসজিদ গেট্ সিউড়ি, বীড়ভূম।

৩) জিয়া বুক স্টোর, জিয়াউল মাদ্রাসা গেট, সিউড়ি, বীড়ভূম।

৪) লেখা প্রকাশনী, ৫৭ ডি. কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭৩

৫) তা'লিম প্রকাশনী, ১২/১ সি, বেচুলবন রোড, কোলকাতা--১৪

৬) বিদ্যার্থী, লোকপুর (হাটতলা), বীরভূম, পুস্তক বিক্রেতা- বিনয় নন্দী।

৭) ডেমুরটীটা মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা উসমান সাহেবের নিকট।

৮) বারাবন (ডাঙ্গাল পাড়া) মসজিদের পেশ ইমাম মওলানা নূরুল আবসারের নিকট।

লেখকের বাড়ীর ঠিকানা

মুহাম্মদ আব্দুল আলিম, গ্রাম ঃ- শালজোড়, পোঃ- বাগ্ডহরী,
থানা ঃ--খয়রাশোল, জেলা ঃ- বীরভূম, পশ্চিম বঙ্গ,
ফোন ঃ- ৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১/৯১ ৮৯২৬১৯৯৪১০